দেখা
না দেখায়
মেশা
অর্পিতা সরকার
BIVA

সূচিপত্র

লাইট ক্যামেরা অভিনয়

ক্লাস সেভেনে আমি প্রথম মা হই।

ক্যামেরার ঝলকানি, সামনে রিপোর্টারের ভিড়।

কয়েকজন তো সীমানার ফিগারটা আরেকবার মেপে নিলো। না, কোথাও কোনও বাড়তি মেদ নেই। চামড়ার টানটাও আলো পড়ে ঝলকাচ্ছে। একটা ক্রীম আর ব্ল্যাক কম্বিনেশনের গাউন পরে, কানে লম্বা ঝোলা দুল, হাতে কপার আর সিলভারের মিক্সড কালারের রিস্টিওয়াচ। পায়ে পেন্সিল হিল। চোখের তারায় আত্মবিশ্বাস।

একজন মহিলা বলল, তাহলে তো সীমানা চৌধুরীর এডুকেশানটা বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে?

সীমানা একটু চুপ করে থেকে বলল, তা হয়েছে... ইচ্ছে ছিল নামি অ্যাডভোকেট হবো, কিন্তু কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে উঠেই মডলিং-এর অফারটা পেয়ে যাই।

আপনার ছেলের বয়স এখন কত ম্যাডাম?

সীমানার ঠোঁটের কোণায় রহস্যের হাসি। একটির ১০ আর একটির ৫৮। এবার পার্সোনাল কথা বাদ দিয়ে আমার কামিং মুভির কথায় আসি।

খুব সুন্দরভাবে নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে মিডিয়ার কাছ থেকে আড়াল করতে শিখে গেছে সীমানা, মাত্র গত চার বছর এই গ্ল্যামার দুনিয়ায় থেকে।

পরিচালক কঙ্কন রায়ের মুভিতে চান্স পেলেন কী করে? এতদিন তো সহ অভিনেত্রী হিসাবেই মুখ দেখা গিয়েছে আপনার?

বিরক্তিটাকে রেড লিপিস্টিকের আড়ালে রেখেই ঘায়েল করা একটা হাসি হেসে সীমানা বলল, সহ অভিনেত্রী ছাড়াও কিন্তু মুভিগুলো সম্পূর্ণ হত না। সহ অভিনেত্রীর ওই দশ মিনিটের অভিনয়েই কঙ্কন রায়ের মতো জহুরীর চোখ হয়তো তার 'ওগো বিদেশিনী'-র নায়িকা খুঁজে পেয়েছেন।

ম্যাডাম আপনাকে কি ওখানে কোন বিদেশিনীর চরিত্রে দেখা যাবে?

মিষ্টি করে হেসে সীমানা বলল, ওটুকু সিক্রেট।

মিডিয়াকে কাটিয়ে প্রডাকশানের গাড়িতে উঠে পড়ল ও।

কয়েকটা সিনেমা হিট করলেই নিজের একটা গাড়ি কিনতে হবে। অন্তত সেকেন্ড হ্যান্ডেড। ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেস্ব গাড়ি না থাকলে সম্মান থাকে না।

চোখের নিচে যাতে ডার্ক সার্কেল না পড়ে সেদিকে নজর দিয়েই রাত দশটার মধ্যে শুয়ে পড়েছে সীমানা, কিন্তু কাঙ্খিত ঘুমটাই যে কিছুতেই আসে না।

সীমা... ডাকছে আটান্ন বছরের মানুষটা। এই বয়েসের মানুষটাকে বৃদ্ধ বলাটা বোধহয় সমীচিন নয়, কিন্তু দীর্ঘকালীন হাই প্রেসার, ডায়াবেটিসের চক্করে এই বয়সে দৃষ্টি শক্তি প্রায় হারাতে বসেছেন সোমনাথ চৌধুরী। মাঝে মাঝেই বলেন, বড় আবছা দেখি আজকাল।

সবে মাত্র নিজের উপার্জনের টাকায় বছর পঁচিশ পর একতলা বাড়িটাকে রিপিয়ারিং করে রং করেছে সীমানা। সোমনাথ চৌধুরীর চোখের ট্রিটমেন্ট চলছে। তবে কোনও বড় জায়গায় যাওয়া এই মুহূর্তে সীমানার পক্ষে সম্ভব নয়।

যাই বাবা... ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলল বাথরুমের দিকে। বাবা আবার ঝাপসা দেখছে। যদি পড়ে যায় তাহলে আবার হাত-পা ভাঙলে সীমানারই বিপদ। তাই সচেতন হয়েই ডাকছে মানুষটা।

সীমানা যেতেই অসহায়ের মতো বললেন, দেখ না আবার সেই অন্ধকার!

হাতটা ধরেই বাচ্চাদের মতো পা ফেলে ফেলে চলতে শুরু করল বাবা।

সীমানার ৫৮ বছরের সন্তান। আরেকজন সীমানার বিছানায় ওর গায়ে পা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। আলতো করে ওর পা'টা সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে এসেছে সীমানা।

ঘর থেকেই ডাক দিল ওর আরেক সন্তান, দিদিভাই... কোথায় গেলি তুই... ? বাবাকে ঘরে পৌঁছে দিয়েই নিজের ঘরে ঢুকে বার দুয়েক পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেই ঘুমিয়ে পড়ল সৌমিক। শুধু নির্ঘুম চোখে ভাবছে সীমানা ... কঙ্কন রায়ের ছবিতে সই করার পর থেকেই ভাবছে। গানের সিকোয়েন্সগুলো তো উনি বিদেশের প্লটে করবেন ঠিক করেছেন, তখন সৌমিক আর বাবাকে কার দায়িত্বে রেখে যাবে ও! যত রাত করেই শুটিং থেকে ফিরুক, দু'টো মানুষ ঘুম ঘুম চোখে অপেক্ষা করেছে এতকাল। এই প্রথম বাড়ির বাইরে গিয়ে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। এর আগে একদিনের দীঘা অথবা শান্তিনিকেতনেই কিংবা দার্জিলিংয়ে কাজ সেরেছে সহ অভিনেত্রী হিসেবে।

ভাবনার অতলে তলিয়ে যেতে যেতে খড়কুটোর মতো মনে পড়ল মিনু মাসির কথা।

সেই মিনু মাসি। বেঁটে খাটো, একমাথা চুল আর কপালে একটা বড় টিপ, সিঁথিটা চওড়া হতে হতে বেশ প্রশস্ত রাস্তা হয়ে গেছে। তবু সিদুঁর পরা কমেনি। বরং সিঁথি বাড়ার সাথে সাথে সিদুঁরের পরিমাণ আরও বেড়েছে। ছোটবেলায় মিনু মাসির আঁচল ধরে সীমানা জিজ্ঞেস করত, ও মাসি বলো না মেসো কোথায় থাকে?

মাসি চোখ দুটো মুহূর্তে চারদিকে ঘুরিয়ে তারপর বলত, উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমের কোথাও একটা থাকে। আমি তো তাকে সেই শেষ দেখেছিলাম তখন আমার বয়স মাত্র সতেরো। সেই যে ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খেয়ে বাড়ি ছাড়ল, আর তো জানতে পারলুম না সে কোথায় গেল বা কেন গেল?

মাসির চোখ দুটো একটু উদাস হয়ে যেত। সীমানা একবার জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার স্বামী যখন থাকে না তখন এত সিদুঁর পরো কেন?

মাসি কপালে হাত ছুঁইয়ে বলেছিল, ওরে এই সিদুঁরের জোরেই তো সে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই সিদুঁরের জোরেই তো আবার কোন দিন আমার কাছে ফিরে আসবে।

বিশ্বাসবিহীন প্রত্যাশারও এত শক্তি থাকে সীমানা সেই বয়সে বোঝেনি।

আজ অবশ্য বোঝে। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস থাকলে সেখানে আশা থাকতে পা
না। কোথাও না কোথাও বিশ্বাসের ছিটেফোঁটাতো নিশ্চয়ই থেকেই যায়।

সৌমিক পাশ ফিরল। ঘুমন্ত সৌমিকের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ দু'টো
জ্বালা করে উঠল সীমানার।

ক্লাস সেভেনের মেয়ের কোলে যখন রমা জেঠিমা নরম কাপড় জড়ানো
রক্তের পুটুলিটাকে দিলো, তখন তো সীমানা ওকে ধরতেই পারছিল না। রমা
জেঠিমা কাঁদতে কাঁদেতেই বলল, তোর মা তোকে এই বয়সেই মা করে দিয়ে
গেল রে সীমা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মায়ের ডেড বডি নিয়ে বাড়িতে ঢুকল পাড়া প্রতিবেশী
আর সঙ্গে অবশ্যই প্রায় সংজ্ঞাহীন ওর বাবা। সীমানার মা মারা গেছে, পৃথিবীর
কোথাও মা নেই এই উপলব্ধিটুকু হতেই ও কাঁদতে শুরু করেছিল, কিন্তু ওর
কান্নাকে ঢেকে দিয়ে কোলের রক্তের ঢেলাটা চিল-চিৎকারে বুঝিয়ে দিলে
পৃথিবীর শক্ত মাটিতে ওর অস্তিত্বের কথা।

নিজের চোখের জল না মুছেই বাচ্চাটাকে ভোলাতে চেষ্টা করছিল ও। মায়ের
পেটে এই ভাইটা ঢোকার পর থেকেই মায়ের রক্ত কমতে থাকে, শরীর অসুখ
হতে শুরু করে। তবু সীমানার মনে আনন্দ ছিল, একটা পুতুল পুতুল ভাই
কি বোন হবে। স্কুলের বন্ধুদের আগাম নিমন্ত্রণ ছিল, মা যেদিন চোখ নড়া
পুতুলকে নিয়ে বাড়ি ঢুকবে সেদিনই ওদের সকলকে চকলেট খাওয়াবে ও।
কোলেরটা অকারণে কেঁদেই চলেছে।

ঠিক সেই সময় মিনু মাসি এসে বাঁচিয়েছিল ওকে। ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে
নিজের স্তনটা ভাইটার মুখে পুরে দিয়েছিল। অদ্ভুতভাবে ভাইটার কান্না থেমে
গিয়েছিল। সীমাকে বলেছিল, যা একটু গরুর দুধ নিয়ে আয়। পাড়ার কাকিমারাই
ব্যবস্থা করেছিল দুধের। মিনু মাসি ওদের বলেছিল, মরণ আমার বুক এখন
শুকনো, রমেশের বয়স কত হল বল দিকিনি! দু'দিন পর ওরই বাচ্চা হবে।
শুধু কান্না ভোলাতে মুখে গুঁজে দিয়েছিলাম।

পাড়ার লোকেরা বাবার মাথায় জল দিচ্ছিল। বাবার নাকি বারবার জ্ঞান

চলে যাচ্ছিল।

সীমানা কাঁদতে কাঁদতে মিনু মাসিকে বলছিল, মাসি গো তুমি আমাদেরকে ছেড়ে যেও না। মিনু মাসি আসলে মায়ের মাসতুতো বোন কিন্তু মায়ের সাথে বরাবরই বড্ড ভাব ছিল। কে জানে বাইয়ের চিল চিৎকার আর সীমানার নোনতা জলের কাকুতিমিনতির দিকে তাকিয়েই বোধহয় মাসি থেকে গিয়েছিল ওদের বাড়িতে।

রমেশদাদা আর বৌদি এসে একদিন দেখা করে মাসির জামাকাপড় দিয়ে গিয়েছিল।

প্রায় মাস ছয়েক ছিল মিনুমাসি। তারপর বাবা আস্তে আস্তে মানসিক ভাবে সুস্থ হয়ে উঠল, ভাইও নরম খাবার খেতে শিখল, শুধু সীমানাই সেবার ক্লাস এইটে উঠল না, সেভেনেই থেকে গেল।

বান্ধবীরা নতুন বইয়ের ঘ্রাণ নিলো। শুধু সীমানার জগৎ জুড়ে একটা কচি গায়ের গন্ধ।

মিনু মাসি চলে গেছে, বাড়িটাকে একটু সামলে নিয়ে আবার আসবে কথা দিয়ে।

একদিন রাতে ভাইয়ের কান্না কিছুতেই থামছিল না। খেলনা দেখিয়ে, কাঁধে ফেলে বাবা অনেক ঘুরিয়েও আনলো। তবুও ভাই কেঁদেই চলেছে। বাবা অধৈর্য হয়ে সীমানার কোলে এনে বসিয়ে দিল।

মনে পড়ে গেল মিনু মাসির সেই কথাটা, দরজা বন্ধ করে ভাইকে কোলে নিয়ে বসেছিল ও। আস্তে আস্তে নিজের সদ্য প্রস্ফুটিত স্তনে ভাইয়ের ঠোঁট ছোঁয়ালো সীমানা। ভাই তার ঠোঁট আর জিভ দিয়ে আস্বাদন করে যাচ্ছিল দুগ্ধবিহীন মাতৃস্তন। মাতৃত্বের স্বাদ কি সেদিনই পেয়েছিল সীমানা?

অদ্ভুত উপায়ে ভাইয়ের কান্না বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেদিনের কথাটা সীমানা কাউকে আর বলেনি।

সকালবেলা সৌমিককে রেডি করে স্কুলে পাঠিয়ে, বাবার খাবার গুছিয়ে, নিজের মেকআপ কিড নিয়ে বসল ও। যদিও স্টুডিও তে ঢোকার পরেই

কার্তিকদা ওর মেকআপ করে দেবে, তবুও রাস্তায় বেরোনোর আগে নিজে
গোছানোটা ভীষণ দরকার। বিশেষ করে টলিউডের এক নম্বর নায়িকাদের
দিয়ে ও যখন সিংহানিয়া ব্যানারের, কঙ্কন রায়ের মতো বড় পরিচালকের
সুযোগ পেয়েছে তখন নিজেকে প্রেজেন্ট করাটা ওর দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে
কন্সিলার দিয়ে নিজের কানের পাশে গভীর ক্ষতটা ঢাকতে ঢাকতেই
পড়ে গেল, আগের দিন মেকআপ ম্যান কার্তিকদা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ম্যা
ছোটবেলায় কোথাও থেকে পড়ে গিয়েছিলেন কি?

ছোট্ট করে মাথা নেড়ে ওর কথার সম্মতি দিয়েছিল সীমানা।

কার্তিকদা আর একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, গাছ থেকে না
মুখে হালকা হাসিটা ছড়িয়ে ও বলেছিল, পেয়ারা গাছ।

কে জানে ক্ষতটা দেখে হয়তো কার্তিকদার মনে হয়েছিল এটা পড়ে যাও
ক্ষত নয়? বাবা ডাকছে পাশের ঘর থেকে। এই মাত্র বাবাকে সবকিছু গুছি
দিয়ে এসেছিল সীমানা, তবুও যে কেন বাবা এতবার ডাকে! যখন অ
করতো তখন কিন্তু বাবা এতটা অবুঝ ছিল না। অসুস্থতার কারণে রিটায়া
আগেই ভি আর নিতে হল বাবাকে। আজকাল তো ভাইও ক্রিকেটের নে
বাদ দিয়ে বাবাকে গল্প পড়ে শোনায়। ঠোঁটের কোণে এক মিষ্টি হাসির রে
দেখা দিল সীমানার। ভাইটাও বড় হয়ে গেল! ছোটবেলায় সীমানার সালোয়া
ওড়না ধরে ঘুরে বেড়াতো পায়ে পায়ে। দেখ তো একটা চিঠি দিয়ে গে
ক্যুরিয়ারের লোকটা। আমি সইও করে দিলাম। কী জানি ঠিক জায়গায় করল
কিনা! বাবার আজকাল আত্মবিশ্বাসটা তলানিতে এসে ঠেকেছে। একটা স
তাও ঠিক জায়গায় করেছে কিনা তাই নিয়ে চিন্তিত।

কোনও পরিচালকের চিঠি নয় তো!

ধুর কী সব ভাবছে সীমানা! মুঠোফোন থাকতে ক্যুরিয়ারে আজকাল কে
চিঠি পাঠায় না। বাবা আগ্রহ ভরে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে আছে খামটার দিকে
কৌতূহল বড় বিষম বস্তু। আর সেটা সব বয়সের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আগে তো কোর্টের সমন বয়ে আনতো এক পেয়াদা। কোর্টের ডেটে ইচ্ছাকৃ

ভাবে হাজির হতো না সীমানা। মিডিয়া হাঁ করেই আছে, মডেল কী সহ অভিনেত্রী বলে ছাড় পেতো না তখন। মিডিয়ার চক্করে রাতারাতি ফেমাস হয়ে যেত ও। তারপর ইন্ডাস্ট্রিতে আনম্যারেড বলে চালানোই দায় ছিল। যদিও থিয়েটার পাড়া থেকে কথাটা একটু আধটু ভেসে আসছিল বটে টালিগঞ্জের বাতাসে, কিন্তু সেই আঁশটে বাতাস শুকে সীমানার ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁজতে যায়নি কেউ। কারণ তখন সীমানা মাত্র দুটো ফর্সা হওয়ার ক্রীম আর একটা টয়লেট পরিস্কার করার লিক্যুইডের অ্যাড দিচ্ছিল।

সীমানা মিউচুয়াল ডিভোর্স চেয়েছিল, কিন্তু রাজীব দিতে চায়নি। আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে বদনাম করে দিতে পারলে আর কাজ পাবে না। না খেতে পেয়ে মরবে তিনটে প্রাণী। এর থেকে সুবিধা আর রাজীবের কিই বা আছে!

ক্যুরিয়ারের খামটা খুলেই দেখল একটা পার্লার থেকে পাঠিয়েছে। বহুদিন আগে ওই পার্লার থেকে বিউটিশিয়ান কোর্স করেছিল সীমানা।

ওদের নতুন শাখা উদ্বোধন করছে বলে, একটা ইনভাইটিং কার্ড পাঠিয়েছে, সীমানা চৌধুরীকে, মানে নবাগতা প্রতিভাময়ী নায়িকাকে।

পার্লারের নামটা দেখে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগের সময়ে। যখন বিনা পয়সায় ও জয়াদির কাছে কাজ শিখতে যেত। নতুন হাতে আইব্রো প্লাক করতে গিয়ে সামান্য ভুলের জন্য একটা কাস্টোমার ভীষণ অপমান করেছিল ওকে। এককোণে কাঁদছিল ও।

জয়াদি ওর পিঠে হাত রেখে বলেছিল, জীবনে যত বেশি ভুল করবি, তত বেশি শিখবি আর নরম মনটাও তখন তলোয়ার হয়ে যাবে। তখন আর তোকে কেউ কাটতে পারবে না, তুই সকলকে ক্ষত-বিক্ষত করতে পারবি অক্লেশে। যত বিজি সিডিউলই থাক জয়াদির পার্লারে ফিতে কাটতে ওই দিন যেতেই হবে।

আজ সীমানার মনের ধার যতই বাড়ুক, কিছু মানুষকে ও এখনও অস্বীকার করতে পারে না। জয়াদি তাদের মধ্যে একজন।

বাইরে গাড়ির হর্ণ।

প্রোডাকশানের গাড়ি এসে গেছে।

বাবাকে আরেকবার ওষুধগুলো বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল সীমানা।

আশপাশের বাড়ির মহিলারা এই সময় তাদের হাতের হাজার একটা ক
ফেলেও, ব্যালকনি কিংবা জানলার আড়ালে দাঁড়াবেই সীমানাকে দেখবার জ

হয়তো ওর গাড়িটা বেরিয়ে যাবার পরই ওর চরিত্র নিয়ে অনেক ক
বলবে কিন্তু আপাতত উঁকিঝুঁকি মেরে ওকে দেখার চেষ্টাটাকে সীমানা ভী
উপভোগ করে।

যখন বাবা ভি.আর নিল। যখন ভাইটা বড্ড ছোট ছিল, যেবার সীম
ক্লাস সেভেনে ফেল করল, তখনো এরা দেখতো। কিন্তু তখন এদের চো
ছিল করুণার ছোঁয়া। আজ দৃষ্টিগুলোতে রয়েছে জমানো ঈর্ষা। এত কা
ফসল হিসাবে ঐ ঈর্ষাটুকু সীমানার প্রাপ্য।

কঙ্কন রায়ের গাড়িটা স্টুডিওর সামনেই পার্ক করা রয়েছে।

হিরো রোহানও হাজির মনে হচ্ছে।

ভিতরে ঢুকেই দেখল শুটিং চলছে। নায়কের সাথে কয়েকটা রাজনৈতি
দলের নেতাদের মিটিংয়ের একাট দৃশ্য শুট করা চলছে।

ইশারায় কঙ্কনদা ওকে মেকআপ নিয়ে রেডি হতে বলল।

রিপোর্টার চৈতি সেন হিসেবে যখন ফ্লোরে ঢুকল সীমানা তখন পরিচালকে
চোখ দেখেই বুঝতে পারল, অন্তত ওর হাঁটা চলায় কোনো জড়তা নে

আজকের শুটিংটা হয়ে যাবার পরেই ঠিক হবে কবে বাইরে যেতে হ
ওদের টিমকে।

ব্যাগের মধ্যে মুঠোফোনের কম্পনটা অনুভব করল সীমানা। ঘড়িতে এখ
বিকেল পাঁচটা। নিশ্চয়ই সৌমিক ফোন করছে।

হ্যাঁ ভাই বল...

দিদিভাই তুই আসার সময় একটা প্রোজেক্টের খাতা আনবি। আরেকটা ২
পেন্সিল। আমি খেয়ে নিয়েছি। ম্যাম আসার আগে একটু কার্টুন দেখছি।

ভাই যখন ফোনে কথা বলে ওর মনে হয় একটা ম্যাচিওর ছেলের সাথে

কথা বলছে। আর যখন ওর ওড়না ধরে ছেলেটা অকাতরে ঘুমায় তখন মনে হয় সেই ন'দিনের ছেলেটা, যার মা হয়ে মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছিল সীমানা ওর মেয়েবেলায়। লক্ষ্মীর মাকে বলা আছে রাতের রান্নার জোগাড়টা করে রেখে দিতে, কিছু করে বেশি টাকাও অবশ্য ওকে দিতে হচ্ছে। শুটিংয়ের হাড়ভাঙা খাটুনির পর, সঠিক স্টেপে নাচ শিখতেও তো যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হচ্ছে সীমানাকে, এরপর বাড়ি ফিরে আর শরীর দিতে চায় না।

নিজের মনেই একটু হেসে নিলো ও। আজকাল ওর শরীরটাও বোধহয় বুঝতে পেরেছে ও বড় ব্যানারে কাজ পেয়েছে। যখন থিয়েটার পাড়ায় প্রতিদিন দু'শো টাকায় ও কাজটা করত, তখন শো এর পরে ঢুলু ঢুলু চোখে ভাত বসাত উনুনে। খিদের জ্বালায় ভাই কাঁদতে শুরু করতো।

সীমানা শোনে ভিসার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সামনের সপ্তাহের প্রথম দিকেই যেতে হবে। দিন সাতেকের জন্য, ব্যাংকক। দুটো গানের সিকোয়েন্স আছে আর কয়েকটা শট, কঙ্কনদা আর সহ পরিচালক বিদ্যুতদা বললেন।

আজকের মতো প্যাকআপ বলেই বেরিয়ে গেলেন উনি।

স্টুডিও থেকে বেরিয়েই আজ মিনু মাসিদের কেষ্টপুরের বাড়িতে হানা দিতে হবে ভেবেই রেখেছিল সীমানা। ফোনে মিনু মাসিকে এতটা বোঝানো সম্ভব নয়। অগত্যা ওদের বাড়িই যেতে হবে। প্রোডাকশানের গাড়ি শুধু বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবে এটাই নির্দেশ আছে। তাই আজ আর গাড়ি না নিয়ে ট্যাক্সি ধরল সীমানা।

হলুদ কালো এই চারচাকাগুলোও ওর কাছে একদিন স্বপ্নই ছিল। যখন থিয়েটার পাড়া থেকে মিনি বাসে গুঁতোগুঁতি করে চারটাকা ভাড়া দিয়ে বাড়ি ফিরত।

রাজীবের সাথে পরিচয় হয়েছিল 'পরিবার' থিয়েটারের সেটে। রাজীব ছিল 'পরিবার'র হিরো। সুপুরুষ রাজীবের প্রেমে তখন অনেকেই হাবুডুবু খাচ্ছে। সহ অভিনেত্রী সীমানার আর দোষ কী! সেও যথারীতি রাজীবের ওই হিরো

হিরো চেহারার প্রেমে পড়ে গেল।

ওদের প্রেমটা থিয়েটার পাড়ার মেকআপ রুম ছাড়িয়ে, থিয়েটারের মঞ্চ অতিক্রম করে, রীতিমতো রাজীবের এক কুঠুরী ঘরে গিয়ে সংসার পাতল।

দিনে বাবা-ভাই আর রাতে রাজীবের সংসার সামলে থিয়েটারের মঞ্চে উঠে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল ও। মাস তিনেকের মধ্যেই খবর এল রাজীবের আরও একটা সংসার আছে। সেখানে নাকি একটা বছর তিনেকের মেয়েও আছে।

সেদিন রাতে প্রশ্নটা সরাসরি করেছিল সীমানা। না, অস্বীকার করেনি রাজীব। বরং উঁচু গলায় বলেছিল, জবা কি তোমার কোনো অসুবিধা করেছে? ও আছে ওর মতো আমার মেয়েকে নিয়ে। তুমিও তোমার মতো থাকো।

সীমানা আর সময় নষ্ট করেনি। নিজের টুকিটাকি জিনিস গুছিয়ে রাজীবের সামনে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

ট্যাক্সি ড্রাইভারের ডাকে সম্বিত ফিরল সীমানার। মিনু মাসির বাড়ি পৌঁছে গেছে সীমানা। ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল ও।

রমেশদা আর বৌদি বাড়িতেই আছে।

সিনেমা, টিভির পর্দায় মুখ দেখিয়ে দেখিয়ে আপাতত সীমানা যে বেশ পরিচিত মুখ সেটা বোঝা গেল মিনু মাসির বাড়ির সামনে মুহূর্তে ভিড় জমে যাওয়ায়।

কেষ্টপুরের মধ্যবিত্ত বাড়ির বৌ মেয়েদের একটা ছোট জটলায় নিজের নামটা বার পাঁচেক শুনতে পেল সীমানা। রমেশদা আর বৌদিও এই ভেবে আপ্লুত যে, হিরোইন আসায় তাদেরও সম্মান বেড়ে যাবে মুহূর্তে। মিনু মাসির বাতের ব্যথাটা একটু বেড়েছে। তবে সীমানা বিপদে পড়েছে শুনে নিজের সমস্যা ভুলে রাজি হয়ে গেল মাসি। এই একটা মানুষ আছে পৃথিবীতে যে সীমানাকে ঠকাবে না, কোন দাবি ছাড়াই নিঃস্বার্থভাবে সীমানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বারেবারে।

সীমানা বলল, কাল এই সময় তোমাকে নিয়ে যাবো, রেডি হয়ে থেকো।

ভাইয়ের প্রয়োজনীয় খাতা-পত্তর কিনে বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে বেশ রাত্রি হয়ে গেল।

বাবা সিরিয়াল দেখছিল, ঐ ঝাপসা ধূসর চোখে কি আদৌ কিছু দেখতে পায় বাবা, নাকি কানে শুনেই আন্দাজ করে পর্দায় কী হচ্ছে।

সীমানা বাড়ি ঢুকতেই বাবা অসন্তোষের গলায় বলে উঠল, এত রাতে বাড়ি ফিরছো, আবার যেন রাজীবের মতো কারো পাল্লায় পরো না। অদ্ভুত ব্যাপার, বাবা এখন নিজে রোজগার করতে পারে না। কিছু জমানো টাকা পড়ে আছে ব্যাঙ্কে। ওষুধপত্র, খাওয়াদাওয়া সবই বহাল তবিয়তে চলছে সীমানার রোজগারের টাকায়। তবুও ও যে ডিভোর্সি ওটা মনে করিয়ে দিতে ভুলে যায় না বাবা। আর রাজীবকে জীবনসঙ্গী করাটা যে ঠিক কতটা ভুল ছিল সেটাও প্রতি পদে পদে স্মরণ করাতে ভোলে না বাবা। যদিও বাবার কথা খুব একটা গায়ে মাখে না সীমানা। তবুও কেন জানে না আজ মাথাটা শান্ত রাখতে পারল না। দুম করে বলে বসল তোমাদের পেটের খাদ্য জোগাড় করার জন্যই রাত পর্যন্ত বাইরে থাকতে হয়। বাবা কোনো কথা না বলে অসহায় দুটো চোখ মেলে তাকাল সীমানার দিকে। ভাইও ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিল দিদির দিকে।

বাড়ির পরিবেশটা মুহূর্তে বদলে যাচ্ছিল দেখেই সীমানা বলল, আজ মিনু মাসির ওখানে গিয়েছিলাম।

নিজের চোখের ভুল কিনা বুঝতে পারল না সীমানা, তবে বাবার মুখে একটা আলগা খুশি ছড়িয়ে পড়ল মনে হলো। সমবয়স্ক মানুষের সাথে সখ্যতাটা স্বাভাবিক কারণেই গড়ে ওঠে। তার বোধহয় একটাই কারণ, তারা একই সাথে ফেলে আসা দিনগুলোতে ফিরে যেতে পারে। বাবা আর মিনু মাসিও মুহূর্তে গল্পের খাতিরে পৌঁছে যেতে পারে বাবার বিয়ের রাতের বাসর ঘরে বা তারাপীঠ যাবার অভিজ্ঞতায়।

ভাইও উৎফুল্ল হয়ে বলছিল, ভালোই হবে দিদিভাই, ঐ ঠাম্মিটা বাড়িতে থাকলে আমিও একটু ক্রিকেট খেলতে যেতে পারবো।

সীমানা ছদ্ম রাগে চোখ পাকিয়ে বলল, তাই বলে আমি যখন বাড়িতে থাকবো না তখন কিন্তু টংটং করে ঘুরে বেড়াবি না।

বাবার এতক্ষণে খেয়াল হতে, আলতো করে জিজ্ঞেস করল, তুই

ক'দিনের জন্য যাচ্ছিস?

আপাতত পাঁচ-সাতদিনের কথা হয়েছে। শুট হয়ে গেলেই ফিরে আসবো।

সীমানার সারাদিনে ব্যস্ততাটাই বেশি পছন্দের। দ্রুততার সাথে গতিতে হাঁপিয়ে যায় বলে স্মৃতি এসে ভিড় জমাতে সাহস পায় না দিনের বেলায়। কিন্তু রাতের নিস্তব্ধতায় ওদের আগমন ঘটে। তখন সবে সবে মডেলিংয়ে ঢুকেছে সীমানা। যদিও খুবই কাকতলীয় ভাবেই মডেলিংয়ের চান্সটা পেয়েছিল ও। মেট্রো স্টেশনের ভিড়ের মধ্যেই রাতুল প্রামাণিক কানের কাছে এসে বলেছিলেন, ফেসটা ফটোজনিক, মডেলিংয়ের অফার আছে। একটা কাগজে নিজের ফোন নম্বরটা লিখে দিয়ে, ট্রেনের পেটের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন উনি।

মুহূর্তে হারিয়ে যাওয়া কথাগুলো কি সত্যি না স্বপ্ন বোঝার জন্য পরের দিনই কাগজে লেখা নম্বরটায় ডায়াল করেছিল সীমানা।

একেবারে লাস্ট রিংটায় ফোনটা রিসিভ করে বলেছিল, রাতুল প্রামাণিক হিয়ার...

ভয়ে ভয়ে নিজের সব থেকে গর্জিয়াস চুড়িদারটা পরে রাতুলবাবুর অফিসে ঢুকেছিল সীমানা।

অ্যাডভারটাইজিংয়ের কোম্পানি। বিভিন্ন অ্যাড এজেন্সিদের মডেল সাপ্লাই করে রাতুল প্রামাণিকের 'নিউ লাইট' কোম্পানি।

ওর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রাতুলবাবু বলেছিলেন, গ্রুমিং-এর প্রয়োজন। সেই প্রথম একটা অচেনা শব্দের সাথে পরিচিত হয়েছিল সীমানা। তারপর পরিচয় হয়েছিল, নিজের অপরিচিত চেহারার সাথে। ঘণ্টা তিনেক পার্লারে থাকার পরে আয়নায় নিজেকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেছিল ও নিজেই।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরতেই বছর সাতেকের ভাই অবাক চোখে খানিকক্ষণ ঐ রঙিন চুলের মেয়েটার মধ্যে ওর দিদিভাইকে খুঁজেছিল। তারপর ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, দিদিভাই তুই বদলে গেলি কেন?

নিজের মনের মধ্যে আসল বদলটা বোধহয় সীমানাও আটকাতে পারেনি।

রাজীবের সাথে বাড়ি থেকে চলে আসার পর থেকেই পুরুষ মানুষের মধ্যে আর বাবা-ভাইয়ের ছবি দেখতে পেতো না ও। সকলের মধ্যেই একটা করে রাজীব লুকিয়ে থাকতো যেন।

তবে আজকের বাস্তবে দাঁড়িয়ে একথা অস্বীকার করার জায়গা থাকে না যে, রাতুল প্রামাণিকের সাথে ওই মেট্রোয় দেখা হয়ে যাওয়াটাই ছিল সীমানার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট।

ছোট পর্দায় গোটা দুই অ্যাড দেবার পরই ও প্রথম সহ অভিনেত্রীর চরিত্রে 'সুখের সংসার' মুভিতে মোট চারবার মুখ দেখাবার সুযোগ পেয়েছিল।

ব্যাংকক যাবার আগেই একটা ফ্রুট ফেসিয়াল করিয়ে নিতে হবে নামী স্পা তে গিয়ে। অভিনয় আর শরীর, মূলধন বলতে এটুকুই তো সম্বল সীমানার।

ভাইটা এখনো বড্ড ছোট, ওকে বড় করতে, লেখাপড়া শেখাতে অনেক টাকা লাগবে সীমানার। তবে দিনরাত এক করে ও কঙ্কন রায়ের ছবিতে খেটে চলেছে তার একটাই কারণ— যদি একবার হিট করে যায় তাহলে ওকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না। সুযোগ এসে ধরা দেবে ওর মুঠোয়। পরিচালক কঙ্কন রায় একটা অদ্ভুত নিয়ম মেনে চলেন। অতি পরিচিত, নম্বার ওয়ান হিরোইন ওনার সিনেমায় কাজ পায় না। ওনার বক্তব্য হলো, ওনার ছবির নায়িকাকে লোকে সেই চরিত্রেই প্রথম চিনুক। বারবার ব্যবহার হয়ে যাওয়া আসবাবের মতো পুরোনো নয়, নতুন ফার্নিচার ঘরে ঢুকলে আমরা যেমন তাকে নিয় ব্যস্ত হয়ে পড়ি, কোথায় রাখবো, রং যেন না নষ্ট হয়ে যায়, তেমনই দর্শকও নতুন নায়িকাকে আবিস্কার করুক। আকর্ষণটা নাকি ওইখানেই।

কাল রাতে ডিস্কো ঠেকে একটা শুটিং আছে। রিপোর্টার চৈতি সেন একজন স্বনামধন্য ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করে পৌঁছে যাবে ডিস্কে। এই চৈতি সেনের চরিত্রে অভিনয় করার আগে পর্যন্ত সীমানার বেশ ভয় ভয় করছিল। ইংরাজি, হিন্দি উচ্চারণগুলো প্রপার করতে পারবে কিনা! তারপরে ওই গ্যাংটাকে টার্গেট করে ব্যাংককে যাওয়া, সব মিলিয়ে বেশ ভয়েই ছিল সীমানা।

কঙ্কনদা মুখে প্রশংসা না করলেও মুখের অভিব্যক্তিতে সীমানা বুঝতে পারে তার কাজে পরিচালক খুশি।

সীমানার এই প্রথম বিদেশ যাত্রা। ভাই কোলের কাছে বসে চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, দিদিভাই তুই কি প্লেনে চেপে যাবি? দিদিভাই ওখানে কি ইংরাজিতে কথা বলতে হয়?

প্রশ্নগুলো সৌমিক কৌতুহল বশে করে ফেলেছে, তবে সীমানার অবস্থাও সৌমিকের মতোই। সেও ওই ফরেনট্রিপটার ব্যাপারে অজ্ঞ।

দীঘা, দার্জিলিং, পুরীতে গেছে শুটিং করতে কিন্তু একেবারে ব্যাংকক, এটা ভাবতেও অবাক লাগছে সীমানার।

পুরোনো স্মৃতিগুলো যতই নাছোড় হোক, খারাপ স্মৃতি থেকে বেরোলেই নতুন সকাল পাওয়ার একটা আশা থেকেই যায়। রাজীবের বিছানায়, ওর ঐ এক কুঠুরি ঘরের অগোছালো সংসারে, ওর দেওয়া আঘাতের কষ্টগুলো মাঝে মাঝে যন্ত্রণা দিলেও আস্তে আস্তে সীমানা পিছনের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে শিখেছে।

ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই হয়তো ভাবছে, সীমানা চৌধুরী নিশ্চয় কঙ্কন রায়ের সাথে বেড শেয়ার করে ওনার বিগ বাজেটের ছবিতে চান্স পেয়েছে। তারা আসলে কঙ্কন রায়কে চেনেই না। যে কোন আর্টিস্টের অভিনয়ে যদি কঙ্কনদা সন্তুষ্ট না হন তাহলে অর্ধেকটা শুট হয়ে গেলেও সেই অভিনেতা বা অভিনেত্রী বাদ পড়ে যায় তার ছবি থেকে। তাই সিলেকশানের পরেও সবাই আতঙ্কে থাকে, শেষ পর্যন্ত থাকতে পারবে তো মুভিটায়।

সীমানা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে নিজের বেস্টটা দেবার। প্রতিনিয়ত শিখছে ও।

মিনু মাসি বাড়িতে আসতেই কয়েক সেকেন্ডে বাড়ির পরিবেশটাই পালটে গেল যেন নিমেষে।

মিনু মাসি এসেই ভাইকে জড়িয়ে ধরে বলল, ওরে গোপাল তুই কত বড় হয়ে গেছিস! ভাই কোনোমতে বলল, মাসিমণি আমার নাম গোপাল

নয় সৌমিক।

মাসি প্রাণখোলা হাসি হেসে বলল, আমার মোটা জিভে ওসব নাম উচ্চারণ হবে না বাপু। আমি ঐ গোপাল বলেই ডাকবো।

মিনু মাসিকে রান্না ঘরে সব বুঝিয়ে দিতে মাত্র চল্লিশ মিনিট লাগল সীমানার। নিজের মতো করে সব বুঝে নিলো মাসি, এবার সীমানা কিছুটা নিশ্চিত।

মিডিয়া যে কীভাবে খবর পেয়ে যায় তা ভগবানই জানে। এয়ারপোর্টে ঢোকার আগেই কোন এক ফিল্মি দুনিয়া চ্যানেলের দু'জন রিপোর্টার এসে ঘিরে ধরল সীমানাকে।

'ওগো বিদেশিনী' মুভীতে সীমানার চরিত্রটাও একজন রিপোর্টারের। তাই রিপোর্টারদের ছুটে আসা, ওদের প্রশ্ন করার স্টাইলগুলো খুব নিখুঁতভাবে লক্ষ্য রেখেছিল ও।

সীমানা আর ঐ মুভির নায়ক রোহানের মধ্যে ঠিক কী ধরনের বন্ধুত্ব আছে সেটা জানাই এদের উদ্দেশ্য। শুধুই বন্ধুত্ব নাকি অন স্ক্রিনের মতো একটু ডিফারেন্ট রিলেশন আছে কিনা এই নিয়েই প্রশ্ন করে গেল রিপোর্টাররা।

রোহান আর সীমানা খুব হালকা চালেই উত্তর দিলো, আপাতত শুটিং-এর বাইরে কোনো কিছু নিয়েই ওরা ভাবছে না। গসিপের গন্ধ না পেয়ে মনক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেল সাংবাদিকরা।

সত্যিই সীমানা আর 'ভালোবাসার' মতো চার অক্ষরের কথায় একেবারেই বিশ্বাসী নয়। ঐ কথাটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে কিছু অবিশ্বাসী স্মৃতি। রাজীবের মনগড়া কিছু মিথ্যে দিয়ে বানানো সীমানার খেলনা সংসার।

পরিচালক নয়ন ঘোষালের কাছে কাজ চাইতে গিয়ে তার ভালোবাসি বলে লালসার চিহ্নটা এখনো রয়ে গেছে সীমানার মুখাবয়বে। যেটাকে মেকআপম্যান কার্ত্তিকদা গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার ক্ষত ভেবেছে, ওটা আসলে নয়ন ঘোষালের কাছে থেকে সম্মান বাঁচিয়ে ফেরার সময় ওর ছুঁড়ে দেওয়া কাঁচের

মদের বোতলের আঘাত চিহ্ন।

তবে এই আঘাতগুলোই সীমানাকে আজকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়ে মানুষ চেনাতে সাহায্য করেছে। মানুষজনের বলা বিরক্তি সূচক কথাগুলো সীমানা বেশি স্বস্তি বোধ করে। ভালোবাসার কথায় বড্ড ভয় করে।

ফ্লাইটের উইন্ডো দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে সীমানা ভাবছিল, আকাশের কাছাকাছি হয়তো পৌঁছোতে পেরেছে ও কিন্তু আকাশকে ছোঁয়া এখনও দেরি। অন্তত একবার ভাইকে নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিতে চায় সীমানা। সৌমিকের প্রশ্নটা কানের মধ্যে ভেসে এল, দিদিভাই বিদেশ কেমন হয়? ঐ টিভিতে যেমন দেখায়?

ব্যাঙ্ককের শুটিং শেষের পরের দিন শপিংয়ে গিয়ে খুব সামান্যই কিছু জিনিস কিনলো। ভাই, বাবা আর মিনু মাসির জন্য।

কঙ্গন রায় খুব আশাবাদী মুভিটা নিয়ে। বিশেষ করে সীমানার অভিনয় নিয়ে। সীমানাও অমানুষিক পরিশ্রম করেছে এই ক'দিনে। শুটিংয়ের আর অল্প অংশই বাকি রয়েছে। যেটা কলকাতায় হবে।

কলকাতায় ফিরেই চমকে গেল সীমানা। কঙ্গন রায়ের ব্যানারে বিজ্ঞাপনের স্টাইলই অন্যরকম। সীমানার অর্ধেক মুখের ছবি আর অল্প কিছু সংলাপ দিয়ে চারদিকে পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। পাবলিকের কৌতূহল তৈরির পদ্ধতিটা কঙ্গনদা ভালোই বোঝেন।

মিনু মাসীকে জোর করে আরো কিছুদিন আটকে রেখেছে সীমানা। ফিল্ম রিলিজের পার্টিতে সকলকে নিয়ে যাবে ঠিক করেই রেখেছে। যদিও বাবা বা মিনু মাসি আদৌ যেতে চাইবে কি না জানে না সীমানা। ভাই তো এখন থেকেই সেই পার্টির একটা কল্পিত চেহারা বানিয়ে বন্ধুদের কাছে গল্প করে বেড়াচ্ছে।

সৌমিক সত্যিই চমকে গেছে। দিদি সিনেমা করলেও এই ধরনের পার্টিতে কোনোদিন সে আগে আসেনি। আর তার ঘরোয়া দিভাইকে তো এ

কাপের আতিশয্যে সে চিনতেই পারছে না। দিভাইয়ের হাসিটাও যেন কেমন পরিচিত লাগছে।

সৌমিক এক কোণে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। দিভাই সকলের সাথে ষ্টি করে হেসে হাত মেলাচ্ছে। কখনো কখনো কেউ আবার এসে দিভাইকে গ করছে। বাড়ির দিভাইটা যেন হঠাৎ ম্যাজিক করে বদলে গেছে। এই দলে যাওয়া দিভাই আর সৌমিকের তিন বছর বয়সে দেখা সেই মায়ের ধ্যে বিস্তর পার্থক্য। সেই মাকে সৌমিক দিদিভাই ডাকতো ঠিক কথা কিন্তু কলের আড়ালে মনে মনে মাই ভাবতো।

সীমানা 'ওগো বিদেশিনী' মুভির প্রিমিয়ারে এসে আরেকটা বিগ বাজেটের ন্য ব্যানারের ছবিতে সাইন করল। কোলাহলের মধ্যে অনেকক্ষণ ভাইকে খয়াল করা হয়নি। দেখল, দূরে একটা কর্ণার টেবিলে মুখ নিচু করে বসে াছে সৌমিক।

কাছে যেতেই দেখতে পেল ভাইয়ের চোখে জল।

জন্ম থেকে যে রক্তের পিন্ডটাকে মানুষ করেছে তার মন পড়তে না পারার কানো কারণ নেই। সৌমিককে দেখেই সীমানা বুঝতে পারল তার পরিচিত দিদিভাইকে চিনতে পারছে না এই পরিবেশে, তাই হয়তো ভাই কাঁদছে।

সীমানার ইচ্ছে হচ্ছিল সব কিছুকে তুচ্ছ করে ছুটে গিয়ে সেই ছোটবেলার তো ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে অন স্ক্রিনে যতই ইমোশানের ছড়াছড়ি হোক, রিয়েল দুনিয়ায় ওটারই বড় অভাব। নিজেকে সংযত করল, লিউডের সম্ভবনাময়ী উঠতি হিরোইন সীমানা চৌধুরী। ভাইকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে এখনো আবেগ বহিঃর্ভুত অনেকটা পথ চলতে হবে সীমানাকে।

ভাইয়ের পিঠে ছোট্ট করে একবার হাত বুলিয়েই মিশে গেল মেকি ঐতিহ্যের জগতে, আলোর রোশনাইয়ে যেখানে চোখের জলকেও হাসিতে রূপান্তরিত করতে হয় সযত্নে। সীমানা এখন শুধুই অভিনেত্রী।

অহংকার

নাচের কল শোগুলোর দিন সত্যিই বড় পরিশ্রম হয় তানিয়ার। নিজের না...
ট্রুপকে রেডি করা তারপর আবার একক নৃত্য থাকে তানিয়ার।

বিশাল ড্রয়িং রুমের শোফায় ক্লান্ত শরীরটাকে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিল তা...
চ্যাটার্জী।

বিখ্যাত ওডিসি শিল্পী তানিয়া এখন নিজের ঘরানা ছেড়ে একটু আধটু ফিউ...
ডান্সে মন দিয়েছে। এই নিজের মস্তিস্ক প্রসূত ক্ল্যাসিক্যাল ডান্সের সাথে বা...
চলতি আধুনিক গানের মেলবন্ধনটা ভীষণ ভাবে প্রশংসিত হয়েছে দর্শক মহ...

আজ যে কল শোটা ছিল সেটা কলকাতার বাইরে। মোটা টাকার অফার দি...
বলেই এক কথায় রাজি হয়েছিল তানিয়া। মাঝে মাঝেই নাচের ফুল কস্টি...
পরে আয়নার সামনে দাঁড়ায় বছর ছত্রিশের তানিয়া। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দে...
নিজেকে। শরীরের কোন অংশে বয়স চুপি চুপি বাসা বাঁধছে না তো?

যদিও ওকে স্টেজে দেখলে বছর ছাব্বিশের বেশি মনে হয় না। দশ ব...
কমিয়ে রাখতে পেরেছে নিজের চেষ্টায়। তানিয়ার ছেলে যে এখন ক্লা...
সিক্সে পড়ছে, ওকে দেখে কে বলবে? যেহেতু ছেলে হোস্টেলে থাকে তা...
অনেকেই জানে না তানিয়ার কোনো সন্তান আছে। তানিয়ার বর দীপাঞ্জ...
নিউরোলজিস্ট। ব্যস্ত ডাক্তার। সত্যি বলতে কি ওই পুজোর ছুটিতেই ...
তিনজনে একসাথে হয়।

বেশির ভাগ সময়ই ফরেনট্রিপ করে ওরা। গত বছর ইতালি গিয়েছিল...
এবছর কোথায় যাবে এখনো ঠিক করেনি তানিয়া। দীপাঞ্জনের কোনো নিজ...
ইচ্ছা নেই। ওষুধ কোম্পানিগুলো যেখানে পাঠাবে সেখানেই রাজি হয়ে যা...
ও। তানিয়া তাও দু-একবার চেঞ্জ করিয়েছে বেড়ানোর স্পট। ওদের এ...

নাগেরবাজারের বিশাল বাড়িটায় যে কেউ একবার তাকালেই বুঝতে পারবে কী প্রচণ্ড পরিমাণে ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। প্রাচুর্যের সম্ভারে অহংকার পরিস্ফুট।

বাইরে গাড়ির আওয়াজ। তার মানে দীপাঞ্জন এল।

তানিয়া জোরে হাঁক পাড়ল, কণক পিসি, দীপ এসেছে, ডিনার টেবিল রেডি করো।

দীপের সাথে তানিয়ার বিয়েটা একেবারেই কাকতলীয় ভাবে হয়েছিল। তানিয়ার পিসতুতো দিদি রিয়ার সাথে দীপের বিয়ের সব ঠিক ঠাক হয়ে গিয়েছিল। অ্যারেঞ্জ ম্যারেজে যা হয়, দুই বাড়ি কথা বলে, একবার ছেলে আর মেয়ে সামনাসামনি দেখা করে বিয়ের ডেট ফাইনাল। যদিও দীপ তখন বিখ্যাত নিউরোলজিস্ট দীপাঞ্জন চ্যাটার্জী হয়ে ওঠেনি। সবে সবে চেম্বারে বসতে শুরু করেছে ও।

তানিয়ার বড় পিসেমশাই তখনকার দিনে পাশ করা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। দীপের বাবা পিসেমশাইয়ের ওষুধকে ধন্বন্তরী বলতেন। সেই থেকে আলাপ। পিসেমশাইকে দীপের পরিবার খুবই সম্মান করতেন। সেই সূত্রেই বড় পিসির মেয়ে রিয়াদির সাথে দীপের বিয়ের কথাবার্তা ফাইনাল হয়েছিল। রিয়াদি তখন মাস্টার্সের ফাইনাল দেবে। বরাবরই তানিয়াদের ভাইবোনেরা রাসভারী বড় পিসেমশাইকে একটু ভয়ই খেত। এমনকি তানিয়ার মা পর্যন্ত নন্দাইয়ের সাথে হাসি মস্করা করে কথাও বলেনি কোনোদিন। তানিয়ার বাবার একটা মুদিখানার দোকান ছিল। দুই কাকা-কাকীমা, খুড়তুতো ভাইবোনেদের নিয়ে তানিয়াদের যৌথ পরিবারে আলাদা করে আদর যত্ন কিছুই পায়নি তানিয়া। মধ্যবিত্ত বাড়ির আর পাঁচটা বাচ্চা যেভাবে মানুষ হয় সেভাবেই মানুষ হয়েছে ও। পাড়ার রেবতীদির কাছে নিজের ইচ্ছেয় নাচ শিখেছিল তানিয়া। স্কুলের ফাংশানে ওর নাচ দেখে অনেকেই বলেছিল, একদিন নৃত্যশিল্পী হবে।

মা বলেছিল, নাচুনে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া ভার। তবুও টিভি চ্যানেল দেখে নাচ তুলতো তানিয়া। রেবতীদি ছিলেন ওডিসি শিল্পী। তাই গুণী ছাত্রী পেয়ে

তানিয়াকে সবটুকু ঢেলে দিয়েছিলেন।

দীপ ফিরেই ওয়াশরুমে ঢুকেছে। তানিয়া হাঁক পাড়ল ডিনার রেডি...।

দীপের বিয়েটা যদি সেদিন রিয়াদির সাথে হয়ে যেত তাহলে হয়তো তানি
আজ প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী তানিয়া চ্যাটার্জী হতেই পারতো না।

দীপের ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বাবা আর বড় পিসেমশাই দু'জনে মিলে ফাল্গুনে
এক সন্ধ্যায় রিয়া আর দীপাঞ্জনের বিয়ের দিন নির্ধারণ করেন। তানিয়া তখন
ফিলোজফি অনার্সের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। পড়াশোনাতে কোনোকালেই
খুব ভালো ছিল না তানিয়া। তবে খুব খারাপও নয়। ওর ধ্যানজ্ঞান ছিল নাচ
ঘুঙুরের আওয়াজে ওর পা দুটো আপনা আপনিই তাল দিতে শুরু করত।

কলেজে ওঠার পরেই তানিয়া দুটো টিউশানি পড়াতে শুরু করেছিল।
টিউশানির টাকায় কত্থক শিখতে শুরু করেছিল ও। নাচের বিভিন্ন ঘরানা
বরাবরই ওকে আকর্ষণ করত।

রিয়ার বিয়ের দিন সকাল থেকেই তানিয়া সেজেগুজে পিসির বাড়িতে ঘুরে
বেড়াচ্ছিল। বিবাহযোগ্যা মেয়ে থাকলে বাবা-মায়ের চিন্তার শেষ থাকে না।
মা হয়তো দু-চারজনকে তানিয়ার জন্য পাত্র দেখতে বলেছিল কথায় কথায়।

দীপ ফ্রেশ হয়ে এসে খেতে বসেছে। তানিয়াকে জিজ্ঞেস করল আজকের
প্রোগ্রাম কেমন হলো?

অন্যমনস্ক তানিয়া বলল, জানো দীপ আজ সন্ধ্যের থেকেই আমাদের বিয়ের
দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। খাওয়া থামিয়ে তানিয়ার চোখের দিকে পূর্ণ
দৃষ্টিতে তাকাল দীপ।

তানিয়া বলল, আজ তো আমার জায়গায় রিয়াদির থাকার কথা ছিল তাই
না?

দীপ ধীরে ধীরে বলল, না নৃত্যশিল্পী তানিয়া ভট্টাচার্যর জায়গায় রিয়া কখনই
বসতো না। রিয়া হয়তো মিসেস দীপাঞ্জন চ্যাটার্জী হতে পারতো কিন্তু তানিয়া

চ্যাটার্জী নয়। তানিয়ার বিয়ের আগে সারনেম ছিল ভট্টাচার্য।

দীপের বেশ অহংকার আছে নিজের স্ত্রীর এই পপুলারিটি নিয়ে। বেশ কয়েকবার ওর সাথে পার্টিতে গিয়ে তানিয়া দেখেছে, দীপ বেশ মজার ছলেই বন্ধুদের বলে, ডাক্তারদের কাছে তো লোকে দায়ে পড়ে আসে, কিন্তু হৃদয়ের টানে তো তানিয়ার নাচ দেখতে যায় হাজার হাজার টাকার টিকিট কেটে। সুন্দরী গুণী স্ত্রীকে নিয়ে নিউরোলজিস্ট দীপাঞ্জন চ্যাটার্জীর বেশ গর্বই হয়। বিয়ের পরে দীপের আগ্রহেই তানিয়া আবার নাচ শুরু করেছিল। দীপের চেম্বার, নার্সিংহোম এসবের জন্যই ওরা কোন্নগরের শ্বশুরবাড়ি থেকে নাগেরবাজারের এই বাড়িতে শিফট করে। নাগেরবাজারের এই বাড়িটা আসলে ছিল এক রিটায়ার্ড প্রফেসরের। প্রফেসরের ছেলে ব্যাঙ্গালোরে চলে যাওয়ায় বাবাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যায়, আর তখনি দীপ এই বাড়িটা কিনে নেয়।

দীপের বিয়ের দিন রাতে রিয়া পালিয়ে গিয়েছিল পাড়ার অরূপদার সাথে। রিয়া নাকি অরূপদাকে ভালোবাসত। সেটা জেনেও পিশেমসাই ডাক্তার জামাইয়ের লোভে কিছুটা জোর করেই রিয়ার বিয়ে দিচ্ছিলেন দীপের সাথে।

বর তখন বিবাহ আসরে উপস্থিত এদিকে পাত্রী পালিয়েছে। দীপের বাবা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি এই আসরেই ছেলের বিয়ে দেব, পাত্রী খোঁজ।

তানিয়ার ছোট পিসি সকালেই শুনেছিলেন তানিয়ার মা ওর বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজছেন, তাই কাল বিলম্ব না করে তানিয়াকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল, দীপের বাবার সামনে।

তানিয়া কিছু বোঝার আগেই দীপের সিঁদুর উঠেছিল ওর মাথায়।

রিয়ার জন্য কেনা বেনারসি পরেই শ্বশুরবাড়িতে পা রেখেছিল তানিয়া।

বাসর রাতে কানে কানে দীপ বলেছিল, আমি বোধহয় জিতলাম।

ততক্ষণে তানিয়া ভালো করে তাকিয়ে দেখেছিল ওর ভবিষ্যতের জীবন সঙ্গীর দিকে।

বেশ হ্যান্ডসাম আর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা দীপাঞ্জনের। কাকুতির গলায় তানিয়া

বলেছিল, সামনেই আমার গ্রাজুয়েসানের পরীক্ষা, নাচের ক্লাস! এখন কী হবে
দীপ ভরসার গলায় বলেছিল, সব হবে, আরও ভালো করে হবে।
সত্যি সব হয়েছিল। আর হয়েছিল বলেই আজ পপুলারিটির এই প্রান্তে
পৌঁছতে পেরেছে।

দীপ শান্ত গলায় বলল, তানি, এত পরিশ্রম করছো, মাঝে মাঝে এক
রেস্ট করো কিন্তু। নাহলে কিন্তু শরীর ভাঙবে।

তানিয়া আদুরে চোখে বলল, ডাক্তারবাবুর আদর কবে কাজে আসবে
কাল পুরো ছুটি নিয়েছি। শুধু সন্ধ্যের দিকে একবার বাবাইয়ের হোস্টেলে
যাওয়ার চেষ্টা করবো। রবিবার ছাড়া তো আবার নরেন্দ্রপুর মিশনে ছেলে
সাথে দেখাও করতে পায় না। তাও আবার সব রবিবার নয়। নিদৃষ্ট দুটো
রবিবার।

ছেলের কথায় মুখে হাসি ফুটল দীপের। কখন যাবে তুমি? তাহলে না হয়
আমিও চেষ্টা করবো চেম্বার থেকে আর বিকেলের দিকে নার্সিংহোমে না গিয়ে
একবার বাবাইকে দেখে আসার?

রবিবার ছুটির সকালে একটু বেশিই আলস্য এসে ঘিরে ধরেছে তানিয়াকে
দীপ নার্সিংহোমে বেরিয়ে গেলেও ওর বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। ছেলেটা
চিকেন দো পিঁয়াজা খেতে চেয়েছিল। আজ একটু বানিয়ে নিয়ে যেতে হবে
কণক পিসিকে বলে রাখতে হবে সব অ্যারেঞ্জ করে রাখতে।

বার দুয়েক বেলের আওয়াজে সচকিত হলো তানিয়া।

নিউজপেপার তো দিয়ে চলে গেছে, দুধওয়ালা নয়। তাহলে কি দীপের
কোনও পেশেন্ট নাকি রে বাবা। কেউ কেউ তো এতটাই নাছোড় হয় যে
বাড়ি পর্যন্ত খুঁজে চলে আসে! নাকি কোনও উঠতি নৃত্যশিল্পী! হয়তো স্টেজ
শো করার জন্য সুযোগ করে দিতে অনুরোধ করতে এসেছে।

সকাল সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। রাত পোশাকটা পরিবর্তন করে সালোয়ার
পরে নিলো তানিয়া।

লক্ষ্মণ এসে খবর দিলো ম্যাডাম একজন দেখা করতে এসেছে।

ভ্রূ কুঁচকে তানিয়া বলল, কোনও প্রোগ্রাম অর্গানাইজার?

লক্ষ্মণ বলল, না ম্যাডাম, একজন মহিলা। বলল, আপনার ছোটবেলার বান্ধবী।

নিজের মনেই হেসে নিলো তানিয়া। তা বটে, টাকা আর সম্মান হলে ছোটবেলার বান্ধবীরা সংখ্যায় বেড়ে যায়।

পরিচিত কেউ নয়। পরিচিত কেউ হলে নিশ্চয়ই কল করেই আসতো। নিশ্চয়ই কোনো সুবিধাবাদী।

একটু বিরক্ত হয়ে চুলে দু'বার চিরুনিটা বুলিয়ে নিয়ে বসার ঘরের দিকে পা বাড়াল তানিয়া।

সোফায় বসে যে মহিলা ওর বাড়ির ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশনের কাজ ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল সে আর যাই হোক তানিয়ার ফ্রেন্ডসার্কেলের কেউ নয়। এত সাধারণ সিন্থেটিক শাড়ি পরে ওর কোনো বান্ধবী রাস্তায় বেড়োয় না অন্তত।

নিশ্চয়ই সাহায্যপ্রার্থী। হয়তো গেটের সিকিউরিটি আটকাবে ভেবেই বন্ধুত্বের আবরণে ঢেকেছে নিজের দারিদ্র।

অত্যন্ত সাধারণ একটা সস্তার শাড়ি, গাল ভেঙে গেছে, চুলের পিছনে গার্ডার করা রুক্ষ চুলের খোঁপা।

তানিয়ার স্লিপারের আওয়াজ পেয়েই মহিলা এদিকে দৃষ্টিপাত করল।

আরেব্বাস তুই তো এখনো একই আছিস রে তানিয়া।

সর্বনাশ! তানিয়া চ্যাটার্জীকে ডিরেক্ট তুই তো ওর ক্লাবের বান্ধবীরাও বলে না।

মহিলাটি একমুখ হেসে বলল, চিনতে পারিসনি তাই না?

বীণাপানি বালিকা বিদ্যালয়, যুবসঙ্ঘ ক্লাব।

বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মেমরি বক্স হাতড়ে খুঁজে বার করে নিয়ে এল তানিয়া। তুই নমিতা না?

একমুখ হেসে সোফার কুশানে গা এলিয়ে দিয়ে বলল, রেখা ম্যাডামের

কাছে ফুল মার্কস পাবার আনন্দ পেলাম রে।

তানিয়াদের স্কুলের ইংরাজীর ম্যাডাম রেখা রায়ের কাছে ফুল মার্কস পাও
ছিল স্বপ্নের মতো। উনি এতটাই নিখুঁত ছিলেন যে, কোনোভাবেই এক নম
ভুল করে দিয়ে ফেলতেন না।

তানিয়া বলল, কিন্তু নমিতা তোর চেহারা এমন হয়েছে কী করে রে?
সেই গোলগোল ফোলা ফোলা গালগুলোই বা কোথায় গেল?

নমিতা বলল, রোগে রোগে জেরবার। কী নেই বল! ডায়াবেটিস, ইউরিক
অ্যাসিড সব ধরেছে রে। তুই বয়সটাকে কলেজের তানিয়াতেই ধরে রেখেছিস।
কী সুন্দর তোর বাড়িটা।

তানিয়ার অভ্যস্ত কানে এই প্রশংসা বাক্যগুলো আর নতুন কোনো আবেদন
নিয়ে ধরা দেয় না, বরং না শুনলেই অবাক হয় ও।

নমিতার সঙ্গে লাস্ট দেখা হয়েছিল উচ্চমাধ্যমিকের শেষ পরীক্ষার দিন।
তারপরই হঠাৎ করে ওর বিয়ে হয়ে যায়।

তানিয়া বলল, তুই এখন কোথায় থাকিস রে? তোর স্বামী কী করেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস সাবধানে ভিতরে চেপে নিয়ে নমিতা বলল, আসলে
অনেকদিন ধরেই তোর কাছে আসবো ভাবছিলাম। আজকাল তো প্রায়ই
টিভিতে তোর মুখ দেখি। আমি তো আমার স্বামীকে আর মেয়েকে দেখাই,
জানো তানিয়া আমার ছোটবেলার বান্ধবী। ওরা বিশ্বাস করতেই চায় না।
আমি ওই কেষ্টপুরের ওদিকটাতে থাকি রে। পলাশের সাথে যখন বিয়ে
হয়েছিল তখন ও একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করতো। সে কোম্পানি
উঠে গেল।

এতক্ষণে তানিয়া বুঝতে পেরেছে ঠিকানা খুঁজে পুরনো বান্ধবীর সাথে
দেখা করতে আসার উদ্দেশ্য।

হ্যাঁরে, তোর হাজবেন্ট তো ডাক্তার না রে?

তানিয়া চায় ওকে সকলে দীপের কথা জিজ্ঞেস করুক। হয়তো কোনও
সাক্ষাৎকারে তানিয়ার সম্পর্কে সব পড়েছে নমিতা। দীপের কথা কাউকে

বলতে গেলে অটোমেটিক্যালি তানিয়ার চোখে মুখে একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার এসে ভিড় করে। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না।

নমিতার সাথে এতক্ষণ কথা বলছে দেখেই কনক পিসি বুঝে গেছে নিশ্চয়ই বেশ পরিচিত কেউ। তাই লুচি তরকারি সাজিয়ে নিয়ে এসেছে এখানেই।

নমিতা বলল, এসব কেন রে।

তানিয়া বলল, এটুকু খেয়ে নে। তোর মেয়ে কীসে পড়ে?

বিগলিত কণ্ঠে নমিতা উত্তর দিল, এই ক্লাস এইটে রে। আমার মেয়ে বলে বলছি না, ওই ব্যাপারে ভগবান আমাকে কৃপা করেছে রে। মেয়ে আমার পড়াশুনাতে খুবই ভালো রে।

নমিতা খেতে শুরু করেছে। খেতে খেতে বলছে, হ্যাঁরে তোর কোনো ছেলেমেয়ে নেই।

তানিয়ার ছেলে সিক্সে পড়ে শুনে বলল, তোকে দেখে কে বলবে এত বড় ছেলের মা! এটাও ভীষণ চেনা প্রশংসা তানিয়ার কাছে।

রবিবারের সকালটা নমিতার সঙ্গে বকে বকেই শেষ হবে মনে হচ্ছে। এত কথা না বলে যদি নমিতা ডিরেক্ট বলত, তানিয়া আমার বড় অভাব কিছু টাকা সাহায্য কর। তাহলে বোধহয় চেকটা লিখে দিয়ে বিদেয় করতে পারতো তানিয়া। তবে বারবার সাহায্য করতে পারবে না তানিয়া। একবারে কুড়ি হাজার মতো দিতেই পারে কিন্তু নমিতা যদি ভেবে থাকে বড়লোক বান্ধবী পেয়ে প্রায়ই হাত পাততে চলে আসবে তাহলে তো চলে না।

নমিতা বলল, আমার স্বামীর চাকরিটা চলে যাওয়ার পর থেকেই আমরা একটু অসুবিধায় পড়েছি রে।

তানিয়া ভাবল, যাক বাবা এতক্ষণে আসল কথায় এসেছে। অ্যামাউন্টটা শোনার অপেক্ষায়...

ছোটবেলার বন্ধু বলে না হয় একটু বেশি দেবে। এমনিতেই পরিচিত দরিদ্রদের অর্থ সাহায্য করে তানিয়া মনে মনে তৃপ্তি পায়।

নমিতা বলল, ওই গয়নাগাটি বেচে আর ওর জমানো টাকা দিয়ে এই মাস

দু'য়েক আগেই একটা দোকান দিয়েছি। ঐ পাড়ার মধ্যে মুদিখানা দোকান ... আরে তানিয়া তোর বাবার যেমন ছিল ওই ব্যানার্জী পাড়ায়, ওরকমই।

চমকে উঠল তানিয়া। সাধারণত ওর এখনকার সোসাইটিতে কেউ জানে না যে তানিয়ার বাবার মুদিখানার দোকান ছিল! কোনো ভাবেই পিছন দিকে তাকাতে চায় না ও। আপাতত বাবাকে একটা ফার্নিচারের শোরুম করে দিয়েছে তানিয়া। দীপ প্রচুর হেল্প করেছে।

নমিতা হেসে বলল, তোর বরের তো প্রচুর টাকা। তোর বাড়ি দেখেই বুঝেছি। তারপর তোদের গ্যারেজে দেখলাম দুটো গাড়ি।

তানিয়া বলল, ওই আর কি। আসলে আমাদের প্রেজেন্ট স্টেটাস মেনটেন করতে গেলে এগুলো লাগে রে!

নমিতা কেমন অকারণে হেসে চলেছে। আশ্চর্য! ওই আর্থিক অবস্থায় থেকেও যে কী করে মানুষের এত হাসি আসে কে জানে?

নমিতা বলল, অনেক বক বক করলাম। এবার আসল যে কারণে এলাম তোর কাছে সেটাই তো বলা হলো না রে।

তানিয়া ভাবল যাক! এতক্ষণে ঢাকনা খুলে পুরোনো বান্ধবীর মুখোশটা খুলবে। অ্যামাউন্টটা শোনার অপেক্ষায় তাকিয়ে আছে তানিয়া।

নমিতা বলল, জানি তোকে একটু বিপদেই ফেলব হয়তো, তবুও পুরোনো বান্ধবীর কথাটা না হয় একটু রাখলি।

তানিয়া একটু বিরক্ত হয়েই বলল, আহা ভণিতা না করে নিজের মতো ভেবেই বলে ফেল...

আবার বোকার মতো হেসে নমিতা বলল, তোর তো অনেক জায়গায় নাচের স্কুল আছে রে... যদি আমার মেয়েটাকে একটু নাচ শেখাস! ও খুব ভালোই নাচে, কিন্তু শেখানোর লোকের অভাব।

অবাক চোখে তাকিয়ে আছে তানিয়া।

সেটা দেখেই বোধহয় নমিতা বলল, আমি জানি তোর পাঁচ থেকে সাতশো টাকা ফিজ। আমি ওটা দিয়েই শেখাবো রে। একটাই ...

খেয়ে না খেয়েও ওকে মানুষ করতে চাই।

তানিয়া চমকে নিজেকে সামলে বলে উঠল, আরে না না ...তোর মেয়েকে আমি বিনা পয়সায় শেখাবো রে।

নমিতা একটু গম্ভীর মুখে বলল, তুই একদিন আমাদের সপরিবারে নিমন্ত্রণ করে বন্ধু বলে খাওয়াস, সেটাতে আপত্তি নেই, কিন্তু বিনা পয়সায় নাচ শেখাতে আপত্তি। নমিতা সরে এসে তানিয়ার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলছে, তুই তোর সঠিক ফিজ নিয়েই আমার মেয়েটাকে ভর্তি করে নে প্লিজ।

তানিয়া তখনও মনে মনে ভাবছে, এটা কি দারিদ্রের অহংকার নাকি সততার! ওর এত প্রাচুর্য দেখেও এতটুকু হিংসার চিহ্ন নেই নমিতার চোখে। সে তারটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট। নমিতার চোখের ওই স্বাভাবিক দৃষ্টিই যেন তানিয়ার আত্মঅহংকারকে মুহূর্তে ধুলিসাৎ করে দিল।

নমিতার প্রস্তাবে রাজি হয়ে সামনের মাস থেকে ওর নাচের স্কুলে পাঠিয়ে দিতে বলল, ওর মেয়েকে।

নমিতা কাঁধের কাপড়ের ব্যাগটা ঠিক করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

আলতো করে বলল, জানি তুই সেলিব্রেটি, তবুও যদি কখনো ওদিকে যাস তো আমার বাড়ি যাস কিন্তু।

নিজের ফোন নম্বর সমেত ভিজিটিং কার্ডটা নমিতার দিকে এগিয়ে দিয়ে তানিয়া বলল, বিপদে পড়লে যোগাযোগ করিস।

নমিতা একই ভাবে হেসে বলল, বিপদে না পড়লেও তোর খোঁজ নেবো র। আরেকটা ছক্কা হানলো তানিয়ার প্রাচুর্যের অহংকারে।

বাইরে বেরিয়ে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়েছে নমিতা। যেন কিছু মনে পড়ে গেছে। নিজের কাপড়ের ব্যাগ হাতড়াচ্ছে ও।

তানিয়াও উঠে পড়েছিল। দেরি হয়ে যাচ্ছে চিকেন দো পিয়াঁজা রেডি করতে হবে।

নমিতা ছাতা, জলের বোতল আর একটা হাতে ধরে একটা ছোট্ট প্লাসটিকের নতুন কৌটো বের করল ব্যাগ থেকে ।

তানিয়ার হাতে দিয়ে বলল, বোঝা, আমার ভুলো মনের মরণ। তোর বানালাম আর বকতে বকতে এটাই দিতে ভুলে যাচ্ছিলাম।

তানিয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কৌটোর দিকে চেয়ে বলল, এগুলো কী ভিতরে?

নমিতা বলল, খেয়ে দেখিস কিছু মনে পড়ে কিনা।

বেরিয়ে গেল নমিতা।

কৌতূহল সামলাতে না পেরে তখনি কৌটো খুলে একটা মুখে তো তানিয়া।

স্বাদটা ভীষণ চেনা। স্মৃতির পাতায় ফুঁ দিতেই বেরিয়ে এল বীণা বিদ্যালয়ের ক্লাস এইটের টিফিন টাইম।

তানিয়া, সুজাতা, নমিতা আর রঞ্জনা চারজনে মিলে টানছে নমিতার টি কৌটো।

নমিতার টিফিন বক্সের বিশেষ আকর্ষণ ছিল, ওর মায়ের করে দে তিলের নাড়ু। নারকেল নাড়ু তো সবার বাড়িতেই হত। কিন্তু ওই তি নাড়ুর স্বাদ ছিল অসম্ভব সুন্দর। কতবার ওদের কাড়াকাড়িতে শেষে নমিতার কপালেই জোটেনি।

মুখের মধ্যে সেই স্কুলবেলার স্বাদ। ধীর পায়ে তানিয়াদের বিশাল পেরোচ্ছে নমিতা। ড্রয়িং রুমের কাঁচের জানলা দিয়ে এখনো দেখা ওকে।

তানিয়ার ভীষণ ইচ্ছে করছিল ছুট্টে গিয়ে সব অহংকার ভুলে মেয়েবেলার মতোই ওকে জড়িয়ে ধরে।

গেট খুলে বেরিয়ে গেল নমিতা। তানিয়া দাঁড়িয়ে রইল নমিতার তিলের নাড়ুর কৌটটা হতে নিয়ে।

টিফিনের ঘণ্টাটা ঢং ঢং করেই বাজল প্রখ্যাত নৃত্য শিল্পী তানিয়া চ্যাট কানের মধ্যে। সচকিত হয়ে তানিয়া ফিরে চলল, ওর দ্রুত এগিয়ে দৈনন্দিন জীবনে...

***

প্রেমের সাইডএফেক্ট

আজ নির্ঘাত দীপ্তর চাকরিটা যাবে। যাবেই...

বার দুয়েক যেতে যেতেও যায়নি ঠিকই। কিন্তু আজ ওর চাকরিটা বাঁচাবে এমন ক্ষমতা বোধহয় স্বয়ং ভগবানেরও নেই। মাত্র এক বছর বেসরকারি ফার্মের চাকরিতে গুনে গুনে একুশটা ছুটি নিয়েছে ও। বিবেক অনেকক্ষণ আগে থেকেই ওয়ার্নিং দিচ্ছে, ওরে দীপ্ত আর মায়া বাড়াস না এই কোম্পানির ক্যান্টিনের অনিয়ন সুপ আর ভেজ বার্গারটার। নিজের স্কাইব্লু তোয়ালে ঢাকা চেয়ারটার দিকে করুণ চোখে তাকালো দীপ্ত। কাল থেকেই এখানে নতুন কেউ বসবে, বসবেই। একটু পরেই অভিজিৎ চ্যাটার্জীর পার্সোনাল সেক্রেটারি বিপস এসে নিজের কালার করা চুলের সামনে ঝুঁকে পড়া লাভলক্সটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বলবেন, মিস্টার দীপ্ত রায় আপনাকে স্যার কল করেছেন, ভেরি আর্জেন্ট।

বিপসের চোখের চাহনিতে থাকবে দীপ্তর চাকরি চলে যাবার পূর্ণ ইঙ্গিত।

কী করবে এবার দীপ্ত! আগের ছ'দিনের ছুটিটা মায়ের অসুস্থতার কারণে নিয়েছিল বলে ম্যানেজ করেছিল। পরের দশদিনটা ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছিল সেই টেঁপিপিসির কোমর ভেঙেছের কারণ ছিল। আজ তো কোনো কারণ ও দেখাতে পারবে না। অভিজিত চ্যাটার্জির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে দীপ্তর বাবা যে ব্যাংকে চাকরি করেন সেই ব্যাংকে। বাবা যে পুরো সুস্থ আছেন সেটা উনি ভালো মতোই হয়তো জানেন।

বাবা কোনোদিনই দীপ্তর কোনো কাজে আসবেন না এটা জানাই ছিল।

এখন যদি ওর চাকরিটা চলে যায়, তাহলে দু'বেলা অপদার্থ বলার
বাবা রেডি। উফফ, আর ভাবতে পারছে না দীপ্ত। একটা কাজ করা
পারে, অভিজিৎ স্যার কিছু বলার আগেই যদি স্যারেন্ডার করা যায়!
কি তাতে কিছু লাভ হবে?

মার্কেটিংয়ের সেলস ম্যানেজার হয়েছে যখন তখন পেট খারাপ হ
কালমেঘের রস খেয়েও অফিসে আসতে হত দীপ্তকে। এখন আর
আটদিনের টানা ছুটিকে ম্যানেজ করা সম্ভব নয়। পিয়ালী ফোন করছে। এদি
ওর চাকরি চলে যাচ্ছে আর প্রেমিকার শাসন শুনতে কার ভালো লাগে
ফোনটা ধরেই দীপ্ত বলল, শোন পিয়ালী এতদিন আমার পয়সায়
বিরিয়ানি গিলেছিস, যতদিন পর্যন্ত আমি আবার নতুন চাকরি না পাই ততদি
পর্যন্ত তুই আমার সিগারেটের খরচা দিবি!

ওদিক থেকে ঝরনার মতো হেসে পিয়ালী বলল, জবটা কি আছে!
গেছে?

এখনো নোটিশ আসেনি শুনে পিয়ালী বলল, তোর জন্য জান লড়ি
দেবে তোর এই অবলা প্রেমিকা। এই জন্যই তোকে বলি দীপ্ত, তোর
বসের সেক্রেটারি টিপসটাকে একটু হাতে রাখ।

দীপ্ত বিরক্ত হয়ে বলল, ওর নাম টিপস নয় পিয়ালী, বিপস।

ওই হল, তুই তো আবার মেয়ে দেখলেই শত হাত দূরে থাকিস।
দুর্দিনে মেয়েরাই সহায় হয়। মেয়েরা মায়ের জাত, তাদের মনটাই যে মারাত্ম
সফ্ট হয় রে।

তুই থামবি! শোন পিয়ালী, আমার এই কঠিন অবস্থায় তোর
ফেমিনিজিমের লেকচারগুলো মারা বন্ধ করবি প্লীজ, তুই প্রথম লাভার
ওর বয়ফ্রেন্ডকে অন্য মেয়ের সাথে ইন্টিমেশি করতে বলছে।

তুই তো আর অভিজিৎ চ্যাটার্জিকে চিনিস না! ভদ্রলোক নিজের বউকে
ভয় পায় না, তো আবার পি এ কে! কাজে সিরিয়াসনেস না থাকলে অভিজি
স্যার ওই বিপসকে বিপাসা রানী মিত্র বানাতে বেশি সময় নেবে না বুঝলি

আহ, দীপ্ত এতগুলো বছরেও কেন যে তোকে মানুষ করতে পারলাম না,
খে আফসোসের একটা চিক চিক আওয়াজ করে বলল পিয়ালী।
ওকে, জাস্ট কুল বেবী, আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তোর বস চ্যাটার্জিকে
কটা চুমু খেতে যাচ্ছি।
বলেই পিয়ালী ফোনটা রেখে দিল।
সত্যি বাবা এই মেয়েকে নিয়ে কী করে যে সংসার করবে দীপ্ত তা ঈশ্বরই
ানেন। দীপ্তর মা বলে, পাগলরা নাকি ইউনিটি খোঁজে, তাই দীপ্তর সঙ্গে
িয়ালীর সম্পর্কটা তৈরি হয়েছে। দু'জনেই নাকি পুরো পাগল।
সেই স্কুল বয়স থেকে পিয়ালী ওর ঘাড়ে চেপেছে এই আঠাশে এসেও
খন নামেনি তখন আটাত্তরেও যে নামবে না সেটা দীপ্ত ভালোই জানে।
িয়ালীর মা মাঝে মাঝে দীপ্তকে বলেন, আমার মেয়েটা পুরো পাগল। তুমি
কটু দেখেশুনে রেখো।
এই মেয়েকে কন্ট্রেল করা নাকি দীপ্তর মতো সাধারণ ছেলের কম্ম! পিয়ালীও
ীপ্তর মতোই আইটি সেক্টারে চাকরি করে। তবে অন্য কোম্পানিতে। কী করে
য বসকে ম্যানেজ করে রেখেছে পিয়ালী, এত কামাই করেও কেমন বহাল
তবিয়তে অফিস যাচ্ছে পিয়ালী। আর সাতদিন কামাই করেই দীপ্তর প্যান্ট
িলে হতে বসেছে।
তবে এবারে অফিস কামইটাতে দীপ্তর কোনো দোষ নেই। ওই বাউলদার
াল্লায় যদি না পড়তো তাহলে ও কিছুতেই এই ভুল করতো না।
সেদিন অফিস ছুটির পর পিয়ালী আর ও মন্টুদার ঘুগনির স্টলে দাঁড়িয়ে
ালপাতায় ঘুগনি খাচ্ছিল। এটা ওরা স্কুলের সময় থেকেই খেত।
এখনই বরং একটু লজ্জা লজ্জা করে। যতই হোক চ্যাটার্জি এন্টারপ্রাইজের
সলস ম্যানেজার হয়ে স্যুট টাই পরে ফুটের দোকানে দাঁড়িয়ে ঘুগনি খেতে
একটু অস্বস্তি হয় বৈকি, কিন্তু পিয়ালী শুনলে তো! সে রীতিমতো লিপস্টিক
াঁচিয়ে পাতাটা চেটে খেয়ে নিতে ওস্তাদ।
ওর পাল্লায় পড়ে, বেশ কিছু পাগলামিতে দীপ্তও ওকে সায় দেয়।

তো সেদিন ঘুগনির দোকানে একটা বাউল তার একতারা নিয়ে টুংটাং ক... করতে হাজির। মন্টুদা রেগে গিয়ে বলল, এখন যাও তো বাপু, সন্ধ্যের ... আর জ্বালিও না।

বাউল বলল, খুব খিদে পেয়েছে তাই একটা গান শোনাতে এলাম ...

মন্টুদা একপাতা ঘুগনি আর একটা পাঁউরুটি ধরিয়ে দিয়ে বলল, ... বিদেয় হও।

লোকটি বলল, আমি ভিক্ষে নিই না।

অবাক চোখে ওই তালিমারা কমলা ড্রেস পরা লম্বাচুলের লোকটি... দেখছিল দীপ্ত!

যা বাবা! ভিক্ষে করতে বেরিয়ে ভিক্ষে নেয় না এর মানেটা কি...

মন্টুদা বলল, তাহলে এখন ভাগো।

পিয়ালী মন্টুদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? ইনি কে? ম... বিরক্ত মুখে বলল, আরে এই ভিড়ের সময় কে ওর বাউল গান শুন... বাউল গান না শুনলে উনি খাবেন না। গান না শুনিয়ে পয়সা নিলে ... ভিক্ষে করা হয়, তাই তেজ করে খাবার না নিয়েই চলে গেল। পাগল এক...

দীপ্ত পকেট থেকে দাম মেটাতে গিয়ে দেখল পাশে পিয়ালী নেই। বাউলটার পিছনে পিছনে ছুটছে।

এক পাগল আর এক পাগলকে ঠিক চিনেছে।

এখন এগারো বছরের প্রেমের দায় বহন করতে দীপ্তও পিয়ালীর পি... ছুটল।

উফ! কী কুক্ষণে যে ক্লাস ইলেভেনে এই মেয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে... দীপ্ত! হঠাৎ টিফিন টাইমে ক্লাস টেনের পিয়ালী ইলেভেনের ক্লাস রুমের সা... দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ডেকেছিল দীপ্তকে। দীপ্ত বাইরে আসতেই বলেছিল, ... ক্রিকেট খেলতে পারিস! একে তো নিচু ক্লাসের মেয়ে এই টোনে কথা বল... তার ওপর আবার তুই সম্বোধন, শুনে মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল দী...

দীপ্ত বলল, পারি, তাতে তোর কী?

পিয়ালী বলল, আমাকে শেখাবি!

দীপ্ত বলেছিল, মেয়েদের ক্রিকেট খেলতে নেই। কিতকিত খেল গে যা।

ঠোঁট উলটে পিয়ালী বলেছিল, কেন রে ভয় করছে... যদি তোর কাছে শিখে তোকে হারিয়ে দিই বলে! সারাজীবন প্লেয়ার হয়ে না থেকে কোচ হতে শেখ। শেখানোর আনন্দ পাবি বুঝলি। আসলে তোদের মতো পাতি বাঙালি সেন্টিমেন্টাল ছেলেরা ভয়েই শেষ হয়ে গেল।

অপমানটা এসে বিধেঁছিল সতেরোর তাজা রক্তে। সেদিন বিকেল থেকেই পাড়ার মাঠে পিয়ালীকে ক্রিকেট শেখাতে লেগেছিল দীপ্ত। দু'দিন পর থেকেই বন্ধুরা রাগাতে শুরু করেছিল। চারদিকে তখন দীপ্ত আর পিয়ালী লেখার ছড়াছড়ি। দীপ্ত ভয় পেয়ে বলেছিল শোন আমার মা-বাবা শুনলে, আমাকে ঠেঙিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেবে। আমি আর তোকে ক্রিকেট শেখাতে পারবো না।

পিয়ালী বলেছিল, আর যদি তোর বাবা-মায়ের আপত্তি না থাকে তাহলে?

পরের দিন টিউশানি থেকে ফিরে দীপ্ত দেখেছিল, পিয়ালী ওর মায়ের প্রায় কোলের কাছে বসে বসে চানাচুর খাচ্ছে। মাকে বলছে, আন্টি এই যে মেয়েদের নিয়ে লোকে এত হ্যাটা করে এটা তো মেয়েদের দোষেই নাকি! এই যে মেয়েরা ফুটবল, ক্রিকেট দেখলেই এত ভয় পায়! এই যে মেয়েরা সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নেয়...

মায়ের খুব নরম জায়গায় গিয়ে আঘাতটা দিয়েছে পিয়ালী। অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাবার জন্য মায়েরও আক্ষেপ কম নেই। তাই পিয়ালীর মাথায় হাত বুলিয়ে মা বলছে, তুই তো দীপ্তর বন্ধু। আমি দীপ্তকে বলে দেব, তোকে যেন ক্রিকেট শেখায়। ওসব পাঁচজনের পাঁচ কথায় কী হবে! লোক তো আছেই বদনাম করার জন্য। সেদিন থেকেই ওই মেয়েকে একটু সমঝে চলে দীপ্ত। বিশেষ করে বাবা যেদিন বলল, পিয়ালীর মতো হতে শেখ। কী জেদ মেয়েটার। ক্রিকেট শিখে তবেই ছাড়বে।

বাবা তো আর জানে না, পিয়ালীর উদ্দেশ্য ক্রিকেট শিখে কোনো টিম জয়েন

করা নয়। ওকে টুয়েলভের প্রদীপদা নাকি বলেছিল, মেয়েদের হাতে ... মানায়। তাই সেই চ্যালেঞ্জ রাখতেই দীপ্তকে হাঁড়িকাঠে বলি করেছে পিয়া... বরাবরই মেয়েদের সাথে কথা বলতে গেলে একটু বাধো বাধো লাগে দীপ্ত... তাই ওর মেয়ে বন্ধু কেউ নেই। সত্যি বলতে কি দীপ্তর বন্ধুই কম। ওই ক্রি... ডাংগুলির ফাঁকেই পিয়ালীর সাথে দীপ্তর একটা দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছি...

দীপ্ত যখন MBA এর সেকেন্ড ইয়ারে তখন একদিন পিয়ালী এসে হা... ওর কলেজ ক্যান্টিনে। দীপ্তকে ডিরেক্ট বলেছিল, বুঝলি দীপ্ত, সবাই ... করছে। মানে আমার সব বন্ধুরাই প্রেম করছে। তাই ভাবলাম আমারও এ... প্রেম করা উচিত। অন্য কাউকে প্রোপোজ করার আগে তোকেই ফার্স্ট চান্স দিতে চাই আরকি। তাই তোকেই প্রোপোজ করলাম। যতই হোক ক্রিকে... শিখিয়ে প্রদীপদার কাছে তুই আমার মাথা উঁচু করে দিয়েছিলি। তারপর ... ধরার সময় অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তুই কোনো সুযোগের সদ্ব্যব... করিসনি। দেখেই মনে হল তোকেই ফার্স্ট চান্স দেওয়া উচিত।

কোনো গল্প উপন্যাস বা বন্ধুদের প্রেম কাহিনি বর্ণনার সময়ও এমনভা... প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে কখনো শোনেনি দীপ্ত।

কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিল যেন।

ওর ওই নিশ্চুপ মুখের সুযোগ নিয়েই পিয়ালী বলেছিল, লজ্জার কি... নেই। আমি তোকে কেন ফেবার করছি এসব ভেবে হীনমন্যতায় ভুগি... না। তোর মতো কেবলুরামকে কেন পছন্দ করলাম, সেটাও আর গভী... গিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। তাহলে ওই কথাই রইল, আমি আ... তুই আজ থেকে প্রেমিক-প্রেমিকা।

কোনো শপিং মল থেকে বার্গেনিং করে সস্তায় জিনিস পেলে যেমন এক... খুশি খুশি মুখ হয়, পিয়ালীও তেমন মুখ করে ক্যান্টিন থেকে বেরি... গিয়েছিল। দীপ্ত তখনও মাছি ঢুকে যাবার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল।

বন্ধুরা এসে আওয়াজ দিলো, তুই তো ছুপা রুস্তম বস। দারুণ স্মার্ট এক... মেয়ে যে তোমার গার্লফ্রেন্ড সেটা তো বলোনি। মুখের হাঁ-টা বন্ধ ক...

আলতো হেসেছিল দীপ্ত। সেদিন থেকেই ওই মারাত্মক পিয়ালী বলে মেয়েটা ভর করেছিল দীপ্তর কাঁধে। বাসে, ট্রেনে, টিকিট লাইনে, সিনেমা হলে সর্বত্রই অবশ্য পিয়ালীই আগে ঢুকে অন্যের সাথে ঝগড়া করে দীপ্তকে সুরক্ষিত করে রেখেছে এতকাল ধরে।

বাউল আর পিয়ালীর পিছনে ছুটে তখন বেশ হাঁপাচ্ছে দীপ্ত।

পিয়ালী বাউলকে ধরেছে।

বাউলের জীবনী রেকর্ড করছে। লোকটির নাম নাকি সদানন্দ। বয়স বছর চল্লিশ হবে। বাড়িতে কাজ কর্ম করতো না, শুধু বিভিন্ন সাইজের একতারা বানাতো আর কোনটায় কেমন সুর ওঠে খুঁজত। সেই থেকেই গানের চর্চা শুরু। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল সদানন্দদা। যেখানে সুর নেই সেখানে ও টিকতে পারে না। বীরভূম, বাঁকুড়া ঘুরে ঘুরে এই মাস খানেক হল কলকাতায় এসে হাজির হয়েছে সে।

না, মাধুকরি সে করবে না। তার গানের বদলেই সে অন্ন সংগ্রহ করবে। পিয়ালী বলল; আসলে শিল্পীরা একটু মুডি হয় বুঝলি দীপ্ত।

দীপ্তর ছোটবেলায় খুব ইচ্ছে ছিল ওই যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বাজাবে আর ঘুরে ঘুরে গোড়ালির ওপর নাচবে। একবার বাবা-মায়ের সাথে শান্তিনিকেতনে গিয়ে ও দু'বার বাজিয়েছিল ওই তারের বাদ্যটা। সেই বাউলটি দীপ্তকে বলেছিল, ওর হাতে সুর আছে। পিয়ালী ওরই মধ্যে বাউলকে বাউলদা বলে ডাকতে শুরু করেছে।

পিয়ালীর ডাক শুনেই হয়তো সদানন্দ গাইতে শুরু করল... পিয়ালী রেকর্ডিং শুরু করল... যদিও এদিকটা একটু নিরিবিলি, তবুও গাড়ির আওয়াজ আসছে বেশ...

"একমনে তোর একতারাতে একটি যে সুর সেইটি বাজা
ফুলবনে তোর একটি কুসুম
তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা..."

আমাদের রবি বাউল বলেছেন, সন্তুষ্ট থাকতে। বুঝলে দিদিমণি থাকতে। অসন্তুষ্ট মন নিয়ে কি সুর বাঁধা যায় গো?

আমাদের এই একতারার একটা তারেও সুর ওঠে গো। বাগানের ফুলেও যে সাজি ভরে ওঠে। কাগজের টাকা বেশি নিয়ে কী আর পেট ভরাতে যে অত চাইনে গো।

পিয়ালী বলল, রবি বাউল মানে আমাদের রবি ঠাকুর?

বাউলদা হেসে বললেন, হ্যাঁগো, উনিই যে এ গান লিখেছেন।

দীপ্তকে চোখের ইশারায় পিয়ালী বলল, কিছু খাবার নিয়ে আসতে। দীপ্ত মনে হচ্ছে সত্যিই তো, ওই কাগজের নোটের পিছনে দৌড়ে দৌড়ে জীবন অর্ধেক কাটিয়ে ফেলবে নাকি! এই তো বাউলাদার কেমন স্বাধীন জীবন বসের চোখ রাঙানি নেই, টার্গেট ফুলফিল করার প্রেসার নেই। শুধু বেড়ান নীল আকাশের নিচে। ছন্দময় অথচ ছন্দবিহীন তার জীবন। পৃথিবী জুড়েই নাকি তার বসতি। এমন এক ধরাবাধাহীন জীবনের স্বপ্ন দীপ্তও দেখত। এই দশটা-পাঁচটার ছকে ফেলা একঘিয়েমির বাইরে।

বাউলদার সামনে ঘুগনী আর পাঁউরুটি ধরতেই উনি বললেন, হ্যাঁ এ আমি খেতে পারি। তোমরা আমরা গান শুনেছো তাই। মাধুকরী আমি না। আমার গলার সুর দিয়ে পেটের ক্ষিদে মেটাই। বাউলদা হেসে বিনিময় প্রথা বুঝলে?

সেই বাউলদাকে সঙ্গে করে পিয়ালী ওর বাড়ি নিয়ে গেছে। পিয়ালীর জেদের কাছে অনেকদিন আগেই ওর বাবা-মা হার মেনেছেন। ও যেটা বলবে সেটা করেই ছাড়বে। আর যত দিন না সেটা হচ্ছে ততদিন নিজেও শ্বাস নেবে না, আর দীপ্তকে নিঃশ্বাস ছাড়তে দেবে না।

ভালোবাসা বড় বিষম বস্তু। জীবনে যে না প্রেমে পড়েছে সে উপলব্ধি করতে পারেনি। এই পাগলীকে যে কেন এত ভালোবাসে সেটা ও নিজে বুঝতে পারে না। পিয়ালীর ওই অভিমান ভরা চোখ দুটো দেখলেই সব ভুলে যায়। আপাতত অফিস যা্ক ভাঁড় মে করে গত সাতদিন

বাউলদাকে নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে পিয়ালী আর দীপ্ত।

পিয়ালীর মাসতুতো বোনের ননদ নাকি কোন টিভি চ্যানেলে কাজ করে। সেখানে তার বাড়ি যাওয়া হলো। সে পাঠালো মিউজিক বাংলা চ্যানেলে কাজ করে সুনন্দা ঘোষ বলে এক মহিলার বাড়িতে। কোনোভাবে যদি বাউলদার একটা প্রোগ্রাম টিভি চ্যানেলে দেখানো যায় তাহলেই বাউলদা ফেমাস হবে। পিয়ালীর ধারণা। এই যার গলা, এরকম দুর্দান্ত যার গান সে কিনা মন্টুদার কাছে মুখ নাড়া খাবে? কিছুতেই নয়। রবি ঠাকুরের গান সে বাউল গাইতে পারে তাকে অবহেলা করা নাকি মহাপাপ, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েই সাতদিন ধরে দীপ্তকে নাকে দড়ি দিয়ে ছুটিয়ে বেরিয়েছে।

পিয়ালীর মাথার ভূতগুলো কিছুতেই দীপ্তকে ঘুমোতে দেয় না। মাঝরাতে ফোন করে পিয়ালী বলে, বুঝলি দীপ্ত ...বাউলদার জন্য একটা সাটিনের জামা অর্ডার করলাম। টিভিতে প্রোগ্রাম করবে আর অমন চটা জামা পরে তাই আবার হয়।

এদিকে বাউলদা আবার বলছে, তার নামের দরকার নেই। গোটা বিশ্বই তার ঘর। সর্বত্রই তার নাম ছড়ানো।

যার জন্য এত খাটাখাটুনি সেই বোধহয় ওদের প্ল্যানে জল ঢালবার ব্যবস্থা করছে।

এখন শেষ পর্যন্ত ওই পাগলা বাউল টিভিতে মুখ দেখাবে না বললেই তো মহা কেলো।

এত সহজে যে পিয়ালী হাল ছাড়বে না সেটা দীপ্তর থেকে কে আর বেশি বোঝে।

পিয়ালীর এইসব অত্যাচার দীপ্ত হাসি মুখে সহ্য করে চলেছে। বাউলদা বলেছে 'পিরিতি কাঁঠালের আঠা লাগলে পরে ছাড়ে না....'

দীপ্তরও হয়েছে এমনই অবস্থা।

পরের দিন ভোরে উঠেই দীপ্তর কাজ বাউলদাকে বোঝানো। টিভিতে প্রোগ্রাম করানোর জন্য রাজি করানো। পিয়ালী বলেছে, জীবনে নাকি একটা টাস্কও

ঠিকঠাক করে করতে পারেনি দীপ্ত, তাই এটা দিয়েই হবে ওর পরীক্ষা
সরম কথার জালে ফাঁসিয়ে বাউলদাকে রাজি করাতেই হবে।
একটা কথা কিছুতেই দীপ্তর মাথায় ঢুকছে না বাউলদা যদি নিজে
পাবলিসিটি না চায় তো পিয়ালীর এত মাথা ব্যথার কারণটা কী?
পিয়ালীকে এই প্রশ্নটা করে লাভ নেই কারণ উত্তর দীপ্তর অজানা।
এত হিসেব-নিকেষ জটিল অঙ্ক কষে তো ব্যবসাদাররা জীবন চালায়,
তো অনুভূতির ফেরিওয়ালা, তাই জীবনের জটিলতম অঙ্কগুলো
অমীমাংসিতই রেখে দিতে চায়। সেদিন পিয়ালীর বাবা বললেন, দীপ্ত
কি বলতে পারো, এই বাউল পর্ব কতদিন চলবে?

আঙ্কেলের গলাটা বড্ড অসহায় লেগেছিল দীপ্তর। আহা রে, আঙ্কেল
জানতো তার ঔরসে এমন একটা দজ্জাল মেয়ের জন্ম হবে!

দীপ্ত চোখের ইশারায় জানিয়েছিল, সেও সঠিক জানে না। পিয়ালীর
সৃষ্টিকর্তা যেখানে তিমিরে পরে আছেন সেখানে দীপ্ত আলোকপাত করতে
পারবে এমন আশা দীপ্তও করে না।

অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর মিউজিক বাংলায় 'বিলুপ্ত ঐতিহ্য' বলে এক
অনুষ্ঠান অ্যারেঞ্জ করা সম্ভব হয়েছে সদানন্দ বাউলের জন্য।

আজ সন্ধ্যেতে সেই অনুষ্ঠানের লাইভ হবে। তাই সকালে অফিসে আসতে
পেরেছে দীপ্ত। যদিও আজ রেজিগনেশান দিতেই আসা হয়েছে অফিসে।
নিজের চেয়ারে বসে কম্পিউটারের স্ক্রিনে চোখ রাখল দীপ্ত।

এবারের পুজোয় পাঞ্জাবীর হিউজ কালেকসান করতে চেয়েছিল চাঁদ
এন্টারপ্রাইজ। বাঙালি ছেলেরা যেন বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বাঙালি
ঐতিহ্যবাহী ধুতি-পাঞ্জাবী পরে বাঙালিয়ানা বজায় রাখতে পারে। ব্যবসার
সাথে সাথে সেটা কার্যকারী করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। প্রজেক্টটা হাতে নেওয়ার
পর থেকেই দীপ্তর অবসর সময়ে মাথায় ঘুরছে এর সব প্ল্যান প্রোগ্রাম।
পিয়ালীর সাথেও কথা বলেছিল, এই পাঞ্জাবীর প্রতি ইয়াং জেনারেশনের
আগ্রহ বাড়ানোর প্রচেষ্টা নিয়ে। পিয়ালী বলেছিল, চটা ফাটা জিনস

তো কারো অঙ্গে আর কোন বেশভূষা তো দেখাই যায় না। তোদের কোম্পানি কিন্তু এটা দারুণ ভেবেছে।

এই প্রজেক্ট নিয়ে আর বোধহয় ভাবার প্রয়োজন নেই দীপ্তর। ও জানে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই স্যাক করে দেওয়া হবে ওকে।

বিপস এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। মিস্টার দীপ্ত আপনাকে মিস্টার চ্যাটার্জী কল করেছেন।

ফাঁসির হুকুম হয়েই গেছে, এবার শুধু ঝুলে পড়ার অপেক্ষা। কনভারসেশনটা শুরু হবে ঠিক এই ভাবে, দীপ্ত আপনার বয়স কম, অন্য কোম্পানিতে কাজ পেতে আশাকরি আপনার অসুবিধা হবে না। আমি আপনার কেরিয়ার নষ্ট করতে চাই না। আপনি ভীষণ রেসপন্সেবল পার্সেন এই কথাই লেখা থাকবে, যাতে অন্য কোথাও জব পেতে প্রবলেম না হয়। কিন্তু কোনো ইরেসপন্সেবেল সেলস ম্যানেজারকে চ্যাটার্জী এন্টারপ্রাইজ রাখবে না।

দীপ্ত জানে চ্যাটার্জী স্যার ঠিক কী বলবে। গার্মেন্টিসের কোম্পানি, সেলসের অনেক চাপ থাকে।

দীপ্ত তবুও শেষ চেষ্টা করে বলল, স্যার এবারের মতো...

স্যার বললেন, তোমার মাসি, পিসি নিশ্চয়ই সকলেই সুস্থ আছেন! সূক্ষ্ম করেই অপমান করতে শুরু করেন বস, তারপর মাত্রা বাড়ান। এটাই ওনার নিজেস্ব স্টাইল। বিপস এসে স্যারের কানের কাছে কিছু বললেন। স্যার বললেন, ওহ, ওনাকে বাইরে একটু ওয়েট করতে বলো। এখুনি ওনার ফিঁয়াসে সারাজীবনের মতো ছুটি পেয়ে যাচ্ছে।

প্রমাদ গুনলেন দীপ্ত। যদি বা মেজ মেসোর ম্যাসিভ অ্যাটাক বলে আটকানোর শেষ চেষ্টা করা যেত, তা নয় বাইরে মূর্তিমান সমস্যা নিজেই এসে হাজির। বিপস বলল, স্যার উনি তো আপনার সাথে মিট করতে চাইছেন, আর্জেন্ট।

অগ্নিদৃষ্টিতে একবার দীপ্তর দিকে তাকিয়ে পিয়ালীকে ভিতরে আনতে বললেন।

দীপ্তর পিঠের ভিতর দিয়ে ভয় নামক ঠান্ডা স্রোতটা নামতে শুরু করে...

পিয়ালী খুব স্মার্টলি ঢুকল। যদিও স্মার্টনেসটা ওর জন্মগত। খুব চা... পরিস্থিতিতেও ও কনফিডেন্ট থাকতে পারে। দীপ্তর মতো তোতলায়... তবে আজকের প্রেসারটা বোঝার ক্ষমতা পিয়ালীরও নেই। এইমাত্র দী... পেটের গুড়গুড়ে আওয়াজটা জানান দিচ্ছে দীপ্তর মাস গেলে পঁয়তাল্লি... হাজার টাকার নিশ্চিন্ত জবটা চলে যেতে বসেছে। কাল থেকেই আবার সেই রেজাল্টের ফাইল হাতে বেকার।

ও বাবা, একে রামে রক্ষে নেই আবার বাউলদাকে সঙ্গে এনেছে পিয়ালী...

অভিজিৎ স্যারকে নমস্কার জানিয়ে দীপ্তর দিকে তাকিয়ে বলল, কী... তোর কি কোনদিন আক্কেল হবে না। আরে তুই তোদের গার্মেন্টিস কোম্পানি... বিজ্ঞাপণের জন্য যে ইউনিক চিন্তাভাবনাটা করেছিস সেটা যে তোর বস... বলছিস, তো মডেলকে আনতেই তো ভুলে গেছিস।

বাউলদাকে এই মুহূর্তে আর চেনাই যাচ্ছে না। মন্টুদা এই অবস্থায় দেখলে হয়তো সব কাজ ফেলে বাউলদার গান শুনতে বসে যেত। বাউলদার দাড়িটা বেশ পালিশ করা, চুলে একটা বেশ সুন্দর রিবন বাঁধা, একটা দুর্দান্ত সিল্কে... পোশাক পরে, হাতে একতারা নিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখে পোজ দিচ্ছে।

অভিজিৎ চ্যাটার্জী ঘাবড়ে গেছেন, এমন দৃশ্য খুব কম সৌভাগ্যবানের চোখে পড়ে। আজ দীপ্ত তার মধ্যে অন্যতম। এই মুহূর্তে ওর সিংহ রাশি... বসও চমকে চোদ্দ হয়ে দীপ্তর দিকে তাকালেন। দীপ্ত আরও অসহায়ভাবে... পিয়ালীর দিকে তাকিয়ে। এক মুহূর্ত আগেও অনুমান করা যায় না পিয়ালী ঠিক কী করতে চলেছে। এটাই বোধহয় এগারো বছরের অভিজ্ঞ প্রেমিক হিসেবে দীপ্তর ব্যর্থতা।

পিয়ালী বলল, আসলে কী হয়েছে স্যার, দীপ্ত বলছিল, এবারের পুজো... নাকি চ্যাটার্জী এন্টারপ্রাইজ পাঞ্জাবির একটা দুর্দান্ত ইউনিক কালেকসান লঞ্চ করতে চলেছে। তবে ঠিক কীভাবে অ্যাড দেবে সেটাই ঠিক করতে পারছে না। তো সেই সুদূর কেন্দুলি থেকে এই সদানন্দ বাউলকে একদিনের জন্য...

আমরা ধরে এনেছি। যদি পাঞ্জাবী পরিহিত মডেলের পাশে সেই একঘেয়ে ঢাকের বাজনা না বেজে বাউলের গান হয় তাহলে কিন্তু অ্যাডটা পুরো জমে যাবে। জাস্ট ইমাজিন স্যার, আপনার মডেল এক একটা রঙের পাঞ্জাবি পরছে, আর সদানন্দ বাউল লাল মাটির রাস্তা দিয়ে তার একতারায় বাংলার গান গাইছে। এই জন্যই তো দীপ্ত এতদিন লিভ এ ছিল। কত সাধ্য সাধনা করে তবে দীপ্ত এই সদানন্দ বাউল মহারাজকে আনতে পেরেছে।

অভিজিৎ চ্যাটার্জীর চোখ বলছে, সে পিয়ালীর গুল গিলছে। উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, গ্রেট, ইউনিক আইডিয়া। ব্রাভো দীপ্ত।

পিয়ালী বলল, কিন্তু স্যার একটু প্রবলেম আছে। আজ সন্ধ্যে সাতটায় সদানন্দ বাউলের টিভি প্রোগ্রাম আছে, মিউজিক বাংলায়। তাই উনি বোধহয় আজ বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না।

বাউলদা বোধহয় পিয়ালীর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই বললেন, দীপ্তকে আমি অন্য নজরে দেখি গো। ও যে খোলা আকাশের মতো নির্মল। ওর কোম্পানির কাজ আমি নিশ্চয়ই করে দেবো।

বাউল মহারাজাকে দিয়ে কন্ট্রাক্ট সাইন করাতে দেরি করতে চান না, অভিজিৎ চ্যাটার্জী, যদি এমন ট্যালেন্ট হাত ছাড়া হয়ে যায়, ভয় পাচ্ছেন বোধহয়।

পিয়ালী বলল, স্যার আমাদের একটু আগেই চ্যানেলের স্টুডিওতে পৌঁছতে হবে।

অভিজিৎ স্যার বললেন, নিশ্চয়ই। আমি গাড়ি অ্যারেঞ্জ করে দিচ্ছি। দীপ্ত কাল থেকে নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে ঢুকবেন। সদানন্দ বাউলের সাথে মডেলদের পরিচয়, অ্যাডটা পুরোটা তৈরি করতে হবে কিন্তু আপনাকেই।

কোম্পানির গাড়িতে বাউলদাকে সঙ্গে নিয়ে দীপ্ত আর পিয়ালী চলেছে মিউজিক বাংলার লাইভ শোতে। বাউলদা গাড়ির মধ্যেই গান ধরেছেন,

“পিরিতি কাঁঠালের আঠা লাগলে পরে ছাড়ে না,
গোলেমালে গোলেমালে পিরিত করো না...”

পিতৃঋণ

ডেডবডি দেখে কোনো মানুষ যে তার উদ্দেশে জুতো ছুঁড়তে পারে
এই প্রথম দেখল সৌম্য। রীতিমতো চোর-ডাকাত মারা গেলেও মৃত্যুর প
সকলে তার এক টুকরো ভালো গুণ খোঁজার চেষ্টা করে থাকে। আহা অ
লোকটা খুনি হোক তবুও নিজের মাকে ভালোবেসেছিল গো! এই ধরনে
কথাই সাধারণত মৃতের উদ্দেশে বলা হয়। সেখানে সুখেনবাবুর মতো
নির্বিবাদী মানুষটা মারা যাবার পর তার দুই ছেলেই ফুলের বদলে মৃতদেহে
ওপর জুতো ছুঁড়েছে।

পোস্ট মর্টেমের পর অনেকেই সেই দৃশ্য দেখেছে।

সজল আর উজ্জ্বল এক মুখ থুতু ফেলে বলেছে, শালা বাপটা মরে
শান্তি দিল না। এখন থানা পুলিশ দৌড়ে বেড়াও।

অবশ্য যে বাসের সাথে ধাক্কা লেগে সুখেনবাবু মারা গেছেন, সেই বাসে
মালিকের কাছে আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছেও ছুটেছে একভাই।
বাবার মৃত দেহের বদলে টাকাটা তো ঠিক সময়েই নিতে হবে।

সৌম্য সজলের ছোটবেলার বন্ধু। তাই ওদের বাড়িতে ছোট থেকে
যাতায়াত ছিল ওর। কতবার খেলতে এসে কাকিমার হাতে লুচি, ঘুগনি খে
গেছে ও। কাকু মাঝে মাঝেই পিঠ চাপড়ে বলতেন, বড় হও, মানুষ হও

কাকু রেলে চাকরি করতেন, সকালবেলা বেরিয়ে যেতেন ফিরতে সেই
সন্ধ্যে। কাকু আর কাকিমার মধ্যে একটা অযথা দূরত্ব চোখে পড়েছিল সৌম্যর।
কেমন দূরত্ব সঠিক ভাবে হয়তো বোঝাতে পারবে না সৌম্য, তবে এই
অচেনা দূরত্বটা ওর বাবা-মা বা মাসি-মেসোর মধ্যে কোনোদিন দেখেইনি।

অথচ রমলা কাকিমা মানে সজলের মা কিন্তু কাকুর অসম্ভব যত্ন করতেন। কাকুও কাকিমাকে স্নেহের চোখেই দেখতেন। তবুও... ঐ খটকাটা সৌম্যর চোখে লাগতো। কখনো সজলকে জিজ্ঞেস করেনি। কারোর বাবা-মা সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়াটা বড্ড অশোভন হয়ে যায়।

তবে মাঝে মাঝে কলেজে এসে সজল বলতো, কপাল করেছি বটে। আমাদের প্রেমের বয়সে এখন আমাদের বাপটা প্রেম মেরে বেড়াচ্ছে, আর সে বুড়ি মাগীও বিয়ে-থা না করে সুখেন দত্তর জন্য পসরা সাজিয়ে বসে আছে।

সৌম্য বলেছিল, তুই চিনিস সেই ভদ্রমহিলাকে?

সজল বলেছিল, চিনি বলতে একদিনই দেখেছিলাম, বাবার সাথে। ফলো করে গিয়ে দেখি, হাতিবাগানে একটা বাড়িতে থাকে, সম্ভবত চাকরি করে বুঝলি।

দুই ছেলের বাপ, ঘরে বৌ আছে জেনেও যে কি করে মহিলা বাবাকে এখনো... কোনোদিন কিছু বলিনি, শুধু সমাজে আমার আর দাদার সম্মানের কথা ভেবেই।

মুখটা কালো করে সজল মাটির দিকে চোখ নামিয়েছিল। সৌম্য বুঝতে পারছিল, নিজের বাবার সম্পর্কে বন্ধুর কাছে এভাবে বলে ফেলে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছে সজল। ওকে স্বাভাবিক করার জন্যই বলেছিল, দেখ কাকু তো কোনোদিন তোদের যত্নের কোন ত্রুটি করেননি। তাছাড়া কাকিমারও কোনো অবহেলা করেননি, তাই থাক না গুরুজনের কাজের সমালোচনা নাই বা করলাম।

তাও সজলের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা আক্রমণাত্মক মুখ কাজ করতো।

একদিন এসে বলল, শালা যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর। মাকে বলতে গেলাম বাবার কীর্তির কথা... সবটা শুনে মা বলল, তোমার বাবার নামে সমালোচনা করাও পাপ।

ভারতীয় নারী, পতিব্রতা নারী।

নীরব শ্রোতা হওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না এক্ষেত্রে।

তারপর তো কেটে গেছে বেশ কয়েকটা বছর। সজল আর সৌম্য দু'জনেই

এখন চাকুরিজীবি। সজলের দাদা উজ্জ্বলদার বিয়ের ঠিক হয়েছে, আর...
বাকি। সজল একদিন সৌম্যর বাড়িতে এসে বলে গিয়েছিল, দাদার...
আমাদের বাড়িতে সাতদিন ধরে তুই থাকবি। আমি একা সামলাতে...
না।

সৌম্য বলেছিল, নিশ্চয়। উজ্জ্বলদা তো আমারও দাদারে। অনেক...
দুই বন্ধু প্রাণ খুলে গল্প করেছিল। শুধু যখন সৌম্য জিজ্ঞেস করেছিল, ...
কাকু কেমন আছেন রে? তখন সজলের চোখে দেখেছিল এক রা...
ভালোই, বলে প্রসঙ্গটা পালটেছিল।

উজ্জ্বলদার বিয়ের আগেই ঘটে গেল এমন দুর্ঘটনা।

সুখেন কাকু মাত্র মাসখানেক আগে রিটায়ার করেছেন। অফিস স...
কোনো কাজেই বোধহয় অফিসে যাচ্ছিলেন, রাস্তা পেরোতে গিয়ে ...
ধাক্কায়, ইন্টারন্যাল হ্যামারেজ বোধহয়... শরীরটা ওপর থেকে দেখে ...
বোঝা যাচ্ছে না।

কাকিমা নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে কাকুর মৃতদেহের একপাশে।

সুখেন কাকু চরিত্রহীন হতে পারেন, কিন্তু অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি ছি...
বলে পাড়ায় কখনো কারোর সাথে ঝগড়া হয়নি। পাড়ার অনেক ...
এসেছে শবযাত্রী হিসাবে।

উজ্জ্বলদা এই মাত্র ইন্স্যুরেন্সের লোকেদের সাথে কথা বলে বাড়ি ...
ঢুকেই ভাইকে বলল, বেওয়ারিশ লাশ বলে ফেলে দিয়ে এলি না ...
বেঁচে থাকতে তো ওনার কথায় চলতে হয়েছে আমাদের। তা হলে ...
ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়া যেত না। তাহলে ফিক্সড ডিপোজিট আর টাকা ...
পাওয়ার সমস্যা হত।

রমলা কাকিমা হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আরেকজন কোথায়!
সে না এলে মুখে অগ্নি সংযোগ হবে না যে?

সজল, উজ্জ্বলদা অবাক চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। তার দুই ছে...
তো বর্তমান। তাহলে মা আবার কার কথা বলছে?

তার মানে কি ঐ মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্কের জেরে সুখেন কাকুর কোনো অবৈধ সন্তান আছে নাকি? কাকিমা হয়তো তার অস্তিত্বের কথা জানেন, তাই আজ কাকুর মৃতদেহের সামনে তাকে আনতে চাইছেন!

উজ্জ্বলদা বলল, ওহ শুধু প্রেমিকা নয়, আবার ছেলেও আছে বুঝি বাবার?

রমলা কাকিমা হাত নেড়ে সৌম্যকে ডাকলেন।

খুব ধীরে ধীরে যে ঠিকানাটা বললেন, সেটা হাতিবাগানের কোনো একটা বাড়ির।

সজল আর উজ্জ্বলদা তাড়া দিচ্ছে সুখেন কাকুর মৃত দেহ নিয়ে শ্মশানের উদ্দেশে যেতে চায়। কিছুতেই বাবার সম্পত্তির তৃতীয় ভাগীদারকে প্রবেশ করতে দেবে না ওরা।

শান্ত রমলা কাকিমার উগ্র মূর্তি দেখে দুই ছেলেই একটু ঘাবড়ে গেছে। রমলা কাকিমা বললেন, সৌম্য ফেরার আগে ওনার দেহ এ বাড়িতেই থাকবে।

সৌম্য ততক্ষণে বাইকে স্টার্ট দিয়েছে।

হাতিবাগানে একটা গলির মধ্যে দোতলা বাড়ির একতলার ঠিকানায় পৌঁছে গেছে সৌম্য। কলিংবেল বাজাতেই একজন মহিলা দরজা খুলল। কাঁচাপাকা চুল, পরনে সবুজ সাদার একটা জামদানী, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, কানে দুটো ছোট কানফুল, হাতে একজোড়া সোনার বালা।

এটুকু সাজে যে কোনো মহিলাকে এতটা সুন্দর লাগতে পারে, সেটা সৌম্য এই প্রথম দেখল। গাম্ভীর্যের আবরণে একটা কোমল চোখের চাহনি।

অষ্টাদশীর গলায় ঐ মহিলা বললেন, কাকে চান?

সৌম্য বলল, আপনিই মানসীদেবী?

ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু এই মুহূর্তে তো আমি আর টিউশনি করছি না। বয়স হয়েছে। স্কুলের চাকরিটা ছাড়তে পারলেই বাঁচি।

ভদ্রমহিলা সম্ভবত সৌম্যকে কোনো কোচিং সেন্টারের হেড ভেবেছেন।

সৌম্য ভুলটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, আমি এসেছি সুখেন কাকুর বাড়ি থেকে। আমাকে রমলা কাকিমা পাঠিয়েছেন।

সৌম্য স্পষ্ট দেখল, চমকে উঠলেন মানসীদেবী।

ধীরে ধীরে বললেন, আমি একা মানুষ। জুনিয়ার হাই স্কুলে শিক্ষক...
বাকি জীবনটা আমার নিজের জমানো টাকায় চলে যাবে বাবা। রমলা...
বলো, মানসী বলেছে, সুখেনের কোনো সম্পত্তি আমি নেব না। সু...
গিয়ে বলো, ওদের নামেই যেন সব লিখে দেয়।

সৌম্য বলল, আপনাকে একবার অন্তত ও বাড়িতে যেতে বলে দি...
কাকিমা। মানসীদেবী হেসে বললেন, সই করতে হবে...

সুখেন খুব চিন্তা করছিল। দুই ছেলে নাকি বাপের সম্পত্তি নিয়ে ম...
করবে, রমলাকে কিছুই দেবে না। এর মধ্যে আবার আমি ঢুকলাম কী...
আমার তো কোনো দাবি নেই ওর সম্পত্তিতে।

কাকিমা বারবার সৌম্যকে বলে দিয়েছেন, হাই প্রেসারের রুগী মানসী...
যেন কোনো ভাবেই ওর বাড়িতে সুখেন কাকুর মৃত্যু সংবাদ দেওয়া না...
এদিকে মহিলা সম্পত্তির কেচ্ছা ভেবে কোনো মতেই যেতে চাইছে...
শেষে সৌম্য বলল, আসলে সুখেনকাকু একটু অসুস্থ হয়ে পড়ে...
আপনাকে একবার দেখতে চেয়েছেন।

কথায় কাজ হলো মনে হচ্ছে।

এক সেকেন্ড দেরি না করে মানসীদেবী ঘরে চাবি ঝুলিয়ে সৌম্যর ব...
এসে বসলেন।

খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, বেঁচে আছে তো? সেরিব্রাল না...
তারপরের কথাগুলো স্বগতোক্তি। এত বললাম, চিন্তা করো না। তবুও দু...
করে যেত। শুধু বলতো, ও চলে গেলে নাকি রমলাকে ছেলেরা দেখবে...
ভাবতে ভাবতে শেষে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ল।

বাড়ির সামনে তখন অনেক লোক।

বুদ্ধিমতী মহিলা মানসীদেবী।

সৌম্যকে বললেন, কখন হলো?

সৌম্য বলল, বাস অ্যাক্সিডেন্ট!

বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই রমলা কাকিমা জড়িয়ে ধরলেন মানসীদেবীকে। সাধারণত এই ধরনের সম্পর্কে স্বামীর অবৈধ প্রেমিকাকে তার স্ত্রী গালাগাল য়, খারাপ নজরে দেখে। এক্ষেত্রে তো রমলা কাকিমাকে অত্যন্ত আধুনিকা াবতে হবে।

মানসীদেবীর দু'চোখে জল।

রমলা কাকিমা প্রলাপ বকছেন। তোমাকে ফাঁকি দিয়েছিলাম আমি, তাই াজ আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল ও।

মানসীদেবী কাকিমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলছেন, এই সময় তোমাকে শক্ত াকতে হবে রমলা। সুখেন নেই, তোমাকেই তো দাঁড়িয়ে থেকে ছেলের বিয়ে দিতে হবে।

সৌম্য শুধু অবাক হয়ে দেখছে। শুধু সৌম্য নয়, দু'ভাই — এতদিন ধরে ারা ওঁকে অনেক নোংরা কথা বলেছে তারাও হাতের কাছে মানসীদেবীকে পেয়েও সামনে কিছু বলতে পারছে না।

মানসীদেবী সুখেন কাকুর পায়ের কাছে এসে বসলেন। নিজের আঁচল দিয়ে ওনার পাটা মুছিয়ে দিলেন যেন। মাথায় ছোঁয়ালেন হাতটা। তারপর নিজের হাত থেকে আংটিটা খুলে সুখেন কাকুর পায়ের কাছে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। নির্দেশের গলায় বললেন, চুল্লিতে ভরে দিও না ওকে। ওর ওই ঘরটায় বড্ড ভয় ছিল। কাঠের চিতা সাজিয়ে ওকে দাহ করো।

শেষের দিকে গলাটা ধরে এসেছিল ওনার।

হঠাৎ রমলা কাকিমা সুখেন কাকুর উদ্দেশে বললেন, আজ তুমি চলে গেছ তাই তোমার কাছে দেওয়া প্রতিজ্ঞা ভাঙলেও আর আমার কোনো ক্ষতি হবে না নিশ্চয়, আজ তোমার সামনেই আমাকে বলতে হবে সবটুকু।

ত্রিশ বছরের সব গোপন কথা। মানসীদেবী বললেন, থাক না রমলা। এই অবস্থায় ওই সব কথা নাই বা বললে। তাছাড়া পুরোনো কথা গোপন থাকাই ভালো!

রমলা কাকিমা দু'দিকে ঘাড় নেড়ে বললেন, তুমি আমাকে অনেকদিন চুপ

করিয়ে রেখেছ, দুই ছেলের চোখে ওই ভগবানের মতো মানুষটার ...
ঘৃণা দেখেছি, তবুও শুধু তোমার আর ওঁর কথা শুনে আমি ছেলেদের ...
থেকে সবটুকু আড়াল করেছি। আজ বলতে দাও।

পাড়ার প্রচুর লোক জমে গেছে। মৃতদেহের চরিত্রের সদগুণ বর্ণনা ...
লোকের অভাব নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই যে লোকটা ছাইভস্মে পরিণত ...
যাবে, তাকেও সমাজের কাছে নিজের চরিত্রের দোষস্খলন করে যেতে ...

খুব ধীরে ধীরে রমলা কাকিমা বলতে শুরু করেছেন। যেন স্মৃতির ...
একটি পাতার ধুলো ঝাড়ছেন সযত্নে।

চোখ দুটো মাঝে মাঝেই বন্ধ করে ফ্ল্যাশব্যাকে দেখে নিচ্ছেন ত্রিশ ...
আগের এক বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যেকে।

রেললাইন ধরে পাগলের মতো ছুটছে রমলা। কোলে একটা বছর দুয়েকের ...
ছেলে আর পেটে আট মাসের সন্তান। তিন জনেরই মৃত্যু কাম্য। ...
মারধোর সহ্য করাটা তখন রমলার সহ্য হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নিজের ...
স্ত্রীর ঘরে পরপুরুষকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল রমলার স্বামী। ওর ব্যবসার ...
জন্য। আর সহ্য করতে পারেনি রমলা, সন্তানদের নিয়ে তাই মৃত্যু ...
সেদিন। ট্রেনটা আসছিল ধেয়ে এমন সময় একটা লোক এসে টেনে নি...
ওদের। জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিল রমলা আর ওর কোলের সন্তানের ...
রাতে ওকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল মানুষটা। সন্তান কোলে ...
একজন মহিলাকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকতেই পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল ...
সুখেনের লুকিয়ে রাখা স্ত্রী আর সন্তান এসেছে। সুখেনের দাদারা মেনে নেয়নি ...
ওর জন্য পরিবারের বদনাম হোক।

গৃহ ছাড়া হয়ে একটা ভাড়া বাড়িতে এনে তুলেছিল ওদের। দুটো দিন ...
না যেতেই বাড়িওয়ালা লোক ডেকে ওদের বিয়ে দিয়ে দেয়। সুখেনের ...
কথাই তখন কেউ শুনতে নারাজ। বিয়ের ক'দিনের মধ্যেই রমলা জানতে ...
পারে সুখেন আর মানসীর কলেজ লাইফ থেকে প্রেমের কথা, ওদের ...
বদলের কথা। মানসীর দিদির বিয়ে হয়ে গেলেই ওদের বিয়ে হবার কথা ...

অপরাধী হয়ে আছে রমলা। সুখেন অনেক
গোদিন থেকে মানসীর কাছে অপরাধী হয়ে আছে রমলা। সুখেন অনেক
বুঝিয়েছে মানসীকে, সংসার পাততে বলেছে অন্য কোথাও, কিন্তু মানসীর
একটাই জেদ যে কোনো ভাবেই বিয়ে করেনি। দাদাদের সংসার থেকে চলে
এসে ঘর ভাড়া করে কাটিয়ে দিল জীবনটা শুধু সুখেনকে ভালোবেসে।
সজলের জন্মের পর রমলা চলে যেতে চেয়েছিল অন্য কোথাও। মানসীই
জোর করে যেতে দেয়নি ওকে। দুই সন্তান নিয়ে পথে পথে ঘুরতে দেয়নি
রমলাকে। তাই কোনোরকম শারীরিক সম্পর্ক ছাড়াই ও আর সুখেন স্বামী-স্ত্রীর
জীবন কাটিয়েছে দিনের পর দিন। সুখেন বলেছিল, দুটো ছোট ছোট নিস্পাপ
শিশুর চোখে নাই বা তাদের আসল বাবার পরিচয়টা প্রকট হলো! আমিই
ওদের বাবা। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল রমলা, কোনোদিন সজল আর উজ্জ্বল জানবে
না, ওদের আসল বাবার পরিচয়।

ওদের জন্মদাতা তার কয়েকমাসের মধ্যেই নতুন বিয়ে করে সংসার
বসিয়েছিল, সে খবরও রমলার কানে এসেছিল।

মানসী প্রতি পুজোয় সজল আর উজ্জ্বলের জন্য জামা কিনে পাঠাতো
সুখেনের হাত দিয়ে। মানসী বলতো, ওদের বলো, ওদের মাসিমণি পাঠিয়েছে।

শব যাত্রীরা এগিয়ে চলেছে, দুই দিকে দুই ছেলের কাঁধে চড়ে চলেছে
মান-অপমানের উর্দ্ধে থাকা একজন মানুষ। যার পরিচয় ছিল সজল-উজ্জ্বলের
বাবা।

এই প্রথম দুই ভায়ের চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তাদের বাবা চলেছে
মহাপ্রস্থানের পথে। পালিত পিতার ঋণ হয়তো তারা এ জীবনে শোধ
করতেও পারবে না।

পিছনে দু'জন মহিয়সী মহিলা... একজন তাকে নিস্বার্থ ভাবে ভালোবেসেছে
সারাজীবন, আর একজন মানবরূপী ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে গেছেন। সৌম্য
সুখেন কাকুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল... একটা পরিতৃপ্তির হাসি যেন
বিরাজ করছে গোটা মুখ জুড়ে। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে অন্যকে খুশি করার
গর্বেই হয়তো এই তৃপ্তি।

অবয়ব

অন্ধকার নিঃস্তব্ধ ঘর, অন্ধকার মানে ইচ্ছাকৃত ভাবেই লাইট জ্বাল... হেড ফোনে নিজের পছন্দের একটা গান শুনছিল চয়নিকা। ... কারোর সাথে আর খেঁজুরে আলাপ করতে মন সাড়া দেয় না।

তন্ময় অফিস থেকে ফিরে নিজের ল্যাপটপে কোনো প্রজেক্টে... ব্যস্ত। তিন্নিটাও কলেজ এক্সকারসনে। বড্ড নিঃসঙ্গ চয়নিকা... নি... নিঃসঙ্গতা কি ওর উপযাচিত হয়ে আহ্বান করা নয়!

পাশের ফ্ল্যাটের বৌদি আগের দিন শপিং-এ যাবার জন্য কত ... করল। না, রাজি হয়নি ও।

অথচ এই শপিংয়ের লাল নীল রঙগুলো ওকে হাতছানি দিয়ে ... এক সময়। হালকা গোলাপীতে নিজেকে জড়িয়ে যখন কলেজ যে... একজোড়া মুগ্ধ দৃষ্টি চয়নিকাকে লজ্জা জড়ানো সুখ দিত। আজক... রঙিন প্রজাপতির ডাকে উদ্বেল হয় না ওর অভিজ্ঞ মন।

তন্ময়ের সাথে বিয়ের কয়েকমাস পর থেকেই দূরত্ব শুরু... ... ঝগড়া, মান-অভিমান নেই, শীতল একটা অলস অনুভূতি ওদের স্বা... সম্পর্কে। পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থেকেও কখনো ওদের স্বামী-স্ত্রীর জোর... আওয়াজ কেউ শুনতে পায়নি। ওরা যে কোনো পার্টিতে একসাথেই... মুখে কৃত্রিম হাসির প্রলেপ ঝুলিয়ে অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হয়ে ওঠে চ... আর তন্ময়। আন্তরিক মান-অভিমানের কোনো স্থান নেই, ওদে... হিমশীতল সম্পর্কে।

(২)

ফোনটা বাজছে অনেকক্ষণ ধরে.

একাকীত্বের নিরবিচ্ছিন্ন সুখানুভূতি থেকে ক্ষণিকের ছুটি নিয়ে ফোনটা রিসিভ করল চয়নিকা। মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে কেউ একজন প্রশ্ন করুক, কেমন আছে চয়নিকা? আবার মনে হয় কী হবে কারোর যান্ত্রিক প্রশ্নে, সাজানো উত্তর 'ভালো আছি' বলে। কয়েক পলকের জন্য হৃদস্পন্দন থমকে গেল যেন। "কেমন আছো চয়নিকা?"

উত্তাল সমুদ্রের একরাশ জলরাশির গম্ভীর গর্জনকে ভ্রুক্ষেপ না করেই যেন সেই গলার স্বর চয়নিকার অন্তরে প্রবেশ করল। "আমি কলকাতায় চয়নিকা। আসতে পারবে কাল একবার?" অস্ফুটে শুধু একটা আওয়াজ বেরোলো ওর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে, "কোথায় যেতে হবে?"

"তোমার সুবিধা মতো... আগের সেই ক্যাফেতে হলে, মন্দ হয় না।"

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠানামার শব্দরা দ্রুতগামী দু'জনেরই।

(৩)

অনেকদিন পর সকাল দশটায় কলেজের বদলে অন্য কোনো কারণে বেরোচ্ছে চয়নিকা। একটা জংলীছাপ শিওর শিল্ক পরে, হালকা মেকআপে নিজেকে গুছিয়ে নিলো, কিছু সিলভার লাইনের অস্বস্তিকর উপস্থিতিই শুধু জানান দেয় বয়সের হিসাব। কায়দা করে চুলটা আঁচড়ে কয়েক বছর কমানো গেল যা হোক।

এতদিন পর আবার সেই ক্যাফেতেই কেন যে নীলাভ ডাকল। আচ্ছা শুধুই কি নীলাভর ডাক! চয়নিকার তীব্র ইচ্ছেটা কি নির্দোষ? ও নিজেও চাইছিল একবার নীলাভর মুখোমুখি হতে।

নীলাভর সামনে আরেকবার গিয়ে জিজ্ঞেস করতে চায়, সুখের অর্থ

কী? নীলাভ কি আদৌ তার দর্শন পেয়েছে? নাকি শেকল ছাড়া হয়ে উড়তে পারেনি সে নীলাকাশে। বিয়ে করবে না বলেও সেই নীলাভও কীসের সন্ধান করতে চেয়েছিল?

বিয়ের পর যে ক'বার তন্ময়ের সাথে শারীরিক মিলন হয়েছে সে বিবাহিত জীবনের অলিখিত শর্ত বলা চলে। নিরুত্তাপ, শীতল শরীর সাড়া দেয়নি কারোর ডাকে। চয়নিকা বা তন্ময় কোনোদিনই জী অপরিহার্য বিষয় ভাবেনি এই দৈহিক মিলনকে।

গলায় মুক্তোর হারের লকটা ঠিক করতে করতেই, সন্ধ্যা মাসিকে চয়নিকা। সন্ধ্যা এ বাড়ির বহু পুরনো কাজের মেয়ে। তাই ও জানে কী খেতে পছন্দ করে বা কী করে না। বড্ড বেমানান লাগছিল ওর আ এই সাজগোজ। ভীষণ উদ্দেশ্যবিহীন। মনের ভিতর একটা ভয়মিশ্রি দলা পাকাচ্ছে চয়নিকার। এটা কি শুধু কষ্ট নাকি কষ্ট কষ্ট সুখ? এ পরও নীলাভ একই রকম ভাবে চয়নিকাকে দেখতে চায়, এটাই কি নয় ওর মনের মধ্যের এই কালবৈশাখীর।

ভাবনাটা নিজের থেকে খুব দ্রুত অপসারিত হলো। হঠাৎ মনে তিন্নির কথা কি জানে নীলাভ?

(৪)

একই কলেজে পড়াতো নীলাভ আর চয়নিকা। খুব স্বাভাবিক বন্ধু দু'জনের মধ্যে। হয়তো বাড়তি একটু ভালোলাগা ছিল মিশে। এ চয়নিকার বিয়েতে সমস্ত কলিগের সাথে নিমন্ত্রিত ছিল নীলাভ।

হাতে রক্ত গোলাপের একরাশ শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের মাঝেই সতৃষ্ণ দৃ চয়নিকার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস গোপন করে নীলাভ স্খলিত বলেছিল, "আমাকে একা করে দিলে চয়নিকা?" কিছু একটা অস্বাভাবি ছিল ওর গলায়, সব হারানোর যন্ত্রণা। ঠিক সেই মুহূর্তে চয়নিকার হয়েছিল, খুব নিজের, খুব আপন কাউকে হারিয়ে ফেলল।

(৫)

রেলের চাকরিটা মাত্র একমাস হলো ছেড়ে দিয়েছে অয়ন। না, চাকরি ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হচ্ছিল না, সমস্যাটা ছিল ওর নিজের অস্তিত্বের বিকাশে। অয়ন লেখক হতে চায়, সারাদিন চাকরি করে লেখার সময় বের করা প্রায় অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল।

তাছাড়া বহ্নিও বারবার বলছিল, তোমাকে পারতেই হবে। দশটা পাঁচটার চাকরি নাকি অয়নের জন্য নয়।

পরিচয়টা সেই ক্লাস টুয়েলভের বিজনবাবুর কোচিং ক্লাসে। কোচিংয়ের সবচেয়ে সুন্দরী আর ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে ছিল বহ্নি, তাই প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ওকে কেউ না কেউ প্রপোস করতো।

অয়ন কোনোদিন ওই ধার মাড়ায়নি, কারণ যার মা সেলাই করে ওদের দুই ভাইকে মানুষ করছেন, তাদের অন্তত প্রেম করার বিলাসিতা মানায় না। পড়ার বইয়ের বাইরে অয়নের একটাই জগৎ ছিল, গল্প লেখা বা গদ্য কবিতা লেখা, যদিও অয়ন ওর লেখার খাতাটা কোনোদিনই কারোর সামনে বের করেনি।

ওটা ওর একান্ত নিজের, অন্তরের অন্তঃস্থলের গোপন কুঠুরির সমস্ত গভীর নিঃশ্বাসের সাক্ষী ওর লেখার খাতাটা।

(৬)

ক্লাস ফাইভে যেদিন প্রথম খবর পেল ওর বাবা ভিড় ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে কাটা পড়ে মারা গেছেন, যেদিন ওর মা ওদের দুই ভাইকে জড়িয়ে ধরে প্রথম চিৎকার করে কেঁদেছিল, সেদিনই ওরা বড় হয়ে গিয়েছিল এক ঝটকায়। নীলাভ ছিল বছর দুয়েকের বড়ো। ছোট থেকেই সে বুঝেছিল অনেক টাকা রোজগার করতে হবে, তবে মুদির দোকানে ধার

হবে না, দুধওয়ালা অপমান করবে না।

আত্মসম্মান যে দারিদ্রের কাছে হেরে যায় সেটা নীলাভ ... স্কুলের ফার্স্ট বয় যখন সরস্বতী পুজোর চাঁদা দিতে পারছিল ... গোটা ক্লাসের সামনে, জগদীশ স্যার বলেছিলেন, "শুধু ফার্স্ট হলে ... না নীলাভ ভদ্রতাটাও শিখতে হয়। পুজোর চাঁদা না দিয়ে স্কুলে ... আসাটা এক ধরনের ভিক্ষাবৃত্তি।"

নম্বরের প্রতিযোগিতায় হারাতে না পারা ছেলেগুলোর চোখ থেকে ... পড়ছিল কৌতুক। নীলাভ মাটির দিকে স্থির তাকিয়ে ছিল। এক ... জল বেরোয়নি ওর অভাবী শুকনো চোখ দিয়ে।

(৭)

অয়ন ছিল কল্পনা বিলাসী, সে ভাবতো ছাপার অক্ষরে তার নাম ... তার কল্পনাগুলোর সামিল হবে হাজার হাজার মানুষ।

রনিতই একমাত্র জানতো তার এই লেখার কথা। ওর গল্প পড়ে ... খুব প্রশংসাও করত। একদিন কোচিং থেকে ফেরার পথে হঠাৎই ... সামনে এসে দাঁড়ায় বহ্নি, তুমি নাকি লেখো? চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে ... দিকে তাকাতেই দেখল রনিত দন্ত বিকশিত করে ক্যাবলার মতো ... আছে।

তোমার লেখা কি আমি পড়তে পারি? সেই শুরু, দুটো তরুণ ... কল্পনার জাল বোনা। কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে প্রথম ... পত্রিকায় প্রকাশ পায় অয়নের একটা ছোট গল্প। বহ্নিই ওকে ... ম্যাগাজিনটায় গল্প দিতে। যতবার অয়ন ভেবেছে লেখা ছেড়ে ... অনেক ব্যর্থতার গ্লানি মেখে লেখনীকে ছুটি দিতে চেয়েছে ঠিক ... বহ্নি ওর অনুপ্রেরণা হয়ে এগিয়ে এসেছে। নিজের শরীরের সমস্ত ... দিয়ে জাগিয়ে তুলেছে অয়নের লেখনী সত্ত্বাকে।

কেটে গেছে বেশ কয়েকটা বছর, আর বোধহয় বহ্নির থেকে ওর বিয়েটা ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। অয়নের দাদা কলেজে চাকুরী নিয়ে এখন বাড়ি ছাড়া।

অয়ন সবে রেলের চাকরিটা পেয়েছে, মা খানিক নিশ্চিন্ত। অতর্কিতেই আঘাতটা এসেছিল অয়নের জীবনে... ওকে একদম নিঃস্ব করে দিয়ে চিরনিদ্রার দেশে পাড়ি জমালো জীবন সংগ্রামে বিধস্ত হয়ে যাওয়া মা। হয়তো মা নিজের ভেতরের ক্ষয়টাকে কোনোদিনই বাইরে আসতে দেয়নি। দুই ছেলের স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব বইতে বইতে ক্লান্তির ঘুমটুকুকেও বিসর্জন দিয়েছিল মা।

বাড়ির সকলের অমতে সর্বস্ব ছেড়ে সেদিন অয়নের কাছে চলে এসেছিল বহ্নি। নমঃ নমঃ করে রেজিস্ট্রি ম্যারেজটাও সেরে নিয়েছিল। মাস্টার্সের পর হণ্যে হয়ে বহ্নি একটা চাকরী জোগাড় করেছিল। সংসার চলছিল নির্দিষ্ট নিয়মে।

বহ্নিই অয়নের লেখার অনুপ্রেরণা। সারাদিনের একঘেয়েমি অফিসের কাজের পর ও যখন ক্লান্ত অবসন্ন মনে নিজের লেখার ডায়েরিতে অবসাদের আঁকিবুঁকি কাটত তখন বহ্নির শরীরের উত্তপ্ত আগুনই অয়নকে নতুন করে লেখার শব্দ জোগাতো। বহ্নির চোখের উৎসাহী চাহনিই অয়নের উপন্যাসে জীবন্ত চরিত্রের রূপ পেত।

(৮)

তমালিকাকে সবাই তিন্নি নামেই বেশি চেনে। ছোট্ট থেকে বাবার উদাসীনতা আর মায়ের অত্যন্ত সচেতনতা তমালিকাকে স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছে। মায়ের এই শাসনের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে ও যখনই বাবার সান্নিধ্যে একটু উষ্ণতা চেয়েছে তখনই পেয়েছে একটা স্বেচ্ছাকৃত উদাসীনতা।

তিন্নিকে মা কিছুতেই ছাড়তে চায়নি এই কলেজের এক্সকারশ...
মা জানে না এই মন্দারমনিতে এসে ও ওদের প্রত্যেকবারের লোক...
ফরেন ট্যুরের থেকে অনেক বেশি আনন্দ পেয়েছে।

তমালিকা যখন লাল কাঁকড়ার সাথে লুকোচুরি খেলায় ব্যস্ত...
খেয়ালই করেনি দূর থেকে একজোড়া মুগ্ধ দৃষ্টি ওকে লক্ষ্য...
তমালিকার ভিজে বালিতে প্রত্যেকটা পদচিহ্ন সে মেপে চ...
কোনটাতে তরুণীর, কোনটাতে কিশোরীর উচ্ছ্বাস লুকিয়ে আছে...
চলেছে দূরের আকাশনীল টপ আর জিন্স পরা মেয়েটার হঠাৎ অ...
হওয়ার কারণটা।

তমালিকা গুনগুনিয়ে উঠছিল মাঝেমাঝে। খুব নিখুঁত সুরে নয়, ...
খুশিতে।

(৯)

অয়নের এতদিনের পরিশ্রম মনে হয় বিফলে গেল, 'উৎসব' প...
বোধহয় ওর উপন্যাসটা মনোনীত হয়নি। নিজের ব্যর্থতার থেকেও ...
কষ্টটা ওকে বেশি পীড়া দিচ্ছে। বহ্নির ঐকান্তিক ইচ্ছায় এই উপন্যা...
শুরু করা। প্রতিটা লাইনে মিশে আছে ওর আকাঙ্খারা। বহ্নি শুনলে ...
আঘাত পাবে। শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছে চরিতার্থ করার জন্য চাকরি ...
বহ্নির ওপর সংসারের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে এই কল্পনার জালবো...
ঠিক হচ্ছে? ভাবনার অতলে ডুব দেয় অয়ন।

অয়ন আর বহ্নির দৃঢ় ধারণা হয়েছিল দাদা কোনোদিন বিয়ে ক...
না। যদি বা করে তাহলে কোনো কলেজের প্রফেসরকেই করবে। ...
হঠাৎ বিনা নোটিশে একই বাসে যাতায়াতের সূত্রে স্বল্প পরিচিত এক সে...
গার্লকে বিয়ে করে বসল নীলাভ। রিসেপসনের পার্টিতে গিয়ে বহ্নি...
সবার আড়ালে দাদা বলেছিল, "জীবনের সব ইচ্ছে পরিপূর্ণতা লাভ ক...
না। তাই তো না পাওয়াগুলো এত মূল্যবান।"

(১০)

চয়নিকা বা তমালিকা দু'জনেই তন্ময়ের বড্ড কাছের, তবু কেন যে ও নিজের আড়ষ্টতার খোলস ভেঙে বেরোতে পারল না এতগুলো বছরেও এটা ওর নিজের কাছেও বিস্ময়। আসলে নিজের স্ত্রী হলে কি হবে চয়নিকা কর্তব্যের বাইরে মানুষ তন্ময়কে জানার চেষ্টাই করেনি কোনোদিন, সে জন্য অবশ্য আংশিকভাবে ও নিজেও দায়ী। মেয়ের সাথেও ওর দূরত্ব তৈরি হয়েছে ওর স্বভাব দোষে। তিন্নি যখন বাবি বলে ওকে জড়িয়ে ধরত ওর পিতৃহৃদয় পূর্ণ হতো এক অনাস্বাদিত তৃপ্তিতে। তিন্নি যত বড়ো হয়েছে ওদের দু'জনের মধ্যে একটা অভেদ্য দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে চয়নিকার কারণহীন জেদ।

আজকাল চয়নিকার শীতল ব্যবহার সেই দেওয়ালটাকে মজবুতভাবে গেঁথে দিয়েছে। তন্ময়ের কাছে বাড়িটা এখন একটা লোক দেখানো আবাসন মাত্র। দিন শেষে প্রাণহীন ফেরার জায়গা। তবুও তন্ময় ফেরে, ফিরতে বাধ্য হয়, কিছুটা হয়তো অভ্যাস আর কিছুটা টান।

(১১)

মন্দারমনির নিঃশব্দ পরিবেশে নিস্তরঙ্গ ঢেউয়ের আনাগোনা আনমনে গুনছিল তিন্নি। আচমকা 'এক্সকিউজমি' শুনে ঘুরে দাঁড়াতেই একটা উস্কোখুস্কো চুলের গ্রিক ভাস্কর্যের মতো একটা লম্বাটে মুখের ছেলের চোখে দৃষ্টি আটকে গেল তিন্নির। হাই আমি নীলাদ্রি, নীলাদ্রি সান্যাল। এমবিবিএস ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট।

তমালিকা রায় খুব সচেতন ভাবে নিজের পরিচয় দিয়ে অপরিচিত ছেলেটির কাছ থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখল।

(১২)

বিয়ের পর চয়নিকা একটা চারচাকা কিনেছিল, কলেজের কলিগ... একটা ছোট্ট ট্রিট দিয়েছিল। নীলাভ আলতো করে বলেছিল, সবার ... মিশতে চাই না। তোমার খুশিতে সামিল হতেই পারি কিন্তু স্বতন্ত্রভা... চয়নিকা মজার ছলেই জানতে চেয়েছিল, সেটা কেমন? নীলাভ দৃষ্টি ... রেখেই বলেছিল, দূর দিগন্তে হারাতে চাই কয়েক ঘণ্টা শুধু তোমার সা... শুধু কি বন্ধুত্বের অধিকারেই সেদিন রাজি হয়েছিল চয়নিকা নীলাভর সা... লং ড্রাইভে যেতে, নাকি তন্ময়ের সাথে বিবাহিত জীবনের ধরাবাঁ... একঘেয়ে জীবন থেকে বেরিয়ে কয়েক ঘণ্টার মুক্তি চেয়েছিল! বিয়ে... পর অন্যের সংসারে বাস করেও নীলাভ আর চয়নিকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক... থেকেই গিয়েছিল।

চয়নিকা বুঝতে পারছিল তন্ময়ের সাথে ওর সম্পর্কটা ঠিক আর পাঁ... স্বামী-স্ত্রীর মতো নয়। কেন নয় তা ওদের দু'জনের কাছেই অজানা...

সেই বৃষ্টির বিকেলের কথাটা ভাবলেই কেমন ভালোলাগায় আর লজ্জা... আবিষ্ট হয়ে যায় চয়নিকা। নীলাভর দু'দিনের জ্বরের কারণে কলেজে... এবসেন্ট ছিল, ফোনে খবরটা পেয়ে চয়নিকা নীলাভর ফ্ল্যাটে চলে যা... কলেজ ছুটির পরে।

উদ্দেশ্য একটাই, ফাঁকা ফ্ল্যাটে মানুষটার আর তো কেউ নেই। তখন... বেশ দুর্বল নীলাভ, চয়নিকাই কফি আর টোস্ট বানিয়ে দিল, ফ্ল্যাটে ঢোকা... পর থেকেই অঝোরে আকাশ ফুঁড়ে বৃষ্টি নেমেছে থামতেই চায় না যেন...

বাড়ি ফেরার জন্য ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল চয়নিকা, একটু উত্তপ্ত শরীরে... নীলাভ আকর্ষণ করেছিল চয়নিকাকে ওই বৃষ্টিস্নাত বিকেলে। দু'জনে... কেউই বুঝতে পারেনি কী ঘটতে চলেছে, দুটো শরীরের মিলন সম্পূ... হয়েছিল অমোঘ নিয়ম মেনে।

চয়নিকা লজ্জায় আরক্ত হয়েছিল, না, দোষ দেয়নি নীলাভকে তবে...

আর কোনো যোগাযোগ রাখতে চায়নি ও।

বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল নীলাভ, বিফলে গিয়েছিল ওর বৃথা পরিশ্রম।

ও হঠাৎই খবর পেয়েছিল বিয়ে করেছে নীলাভ। ততদিনে কলেজের চাকরি ছেড়ে কোনো এক বিদেশি কোম্পানি জয়েন করেছিল নীলাভ।

আজ এতগুলো বছর পর হঠাৎ নীলাভর ফোনে স্মৃতির পাতারা বিদ্রোহ করছে। এতদিনের ভুলে থাকার চেষ্টারা ব্যর্থ হয়েছে। নীলাভর গলায় নিজের নামটা শোনায় সেই বিকেলের মাদকতা মিশে ছিল কি!

(১৩)

জানে না অয়ন এটা ঠিক করেছে কিনা, বহ্নির সাথে নয় এটা যেন নিজের চির পরিচিত অস্তিত্বের সাথেই লুকোচুরি।

রায়নার এই ব্যক্তিত্ব, কথা বলার ধরণ কীভাবে যেন অয়নকে আকর্ষণ করে চলেছে। 'সময়হীন' এর এডিটর রায়না। বেশ নাম করা পত্রিকা। অয়নের 'ফেরিওয়ালা' উপন্যাসটা 'উৎসব' পত্রিকায় রিজেক্ট হবার পর 'সময়হীনে' পাঠিয়েছিল অয়ন। সেই সূত্রেই রায়নার সাথে পরিচয়। সময়হীনে 'ফেরিওয়ালা' উপন্যাসটা সিলেক্ট হবার পর বার চারেক রায়নার সাথে দেখা হলো অয়নের।

বহ্নিই ওর অনুপ্রেরণা, ওর লেখনি শক্তি, বহ্নিই তো ওর সবটা জুড়ে আছে তবুও যে কেন কোন্ ছিদ্র দিয়ে রায়না ঢুকে পড়েছে, অয়ন বুঝতে পারছে না।

রায়না সিগারেট খায়, কিছুদিন আগেও লিভটুগেদার করতো সুব্রত বলে একটা ছেলের সাথে। কোনো কারণে বনিবনা না হওয়ায় এখন সিঙ্গেল থাকে।

ওর ওই উগ্র চালচলনই অয়নের আকর্ষণের কারণ। রায়না যদি পাহাড়ি খরস্রোতা ঝরনা হয় তো বহ্নি খুব শান্ত শীতল নদী।

(১৪)

আজকাল অয়নের এই পার্থক্যটা বেশ চোখে লাগছে বহ্নির। লিখছে না তবু স্টাডিতে গিয়ে আঁকিবুকি কাটছে। বহ্নির কাছ থেকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা। বিস্মিত হয়ে যায় বহ্নি, এত চেনা অয়নের অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখে। লেখা নিয়ে অয়নের একাত্ম হয়ে বহ্নির অচেনা নয়। তবে আজকের অয়নের এই চাহনি বড় অচেনা বহ্নির। অয়নের সব লড়াই, সব হেরে যাওয়ার চিহ্নগুলো বহ্নির অত্যন্ত পরিষ্কার। কিন্তু অয়নের এই অপরাধীর মতো দৃষ্টিটা বহ্নির অপরিচিত। কিছু লোকাতে চাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় ও যেন কিছুটা

(১৫)

বেশ সময় নিয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিল চয়নিকা, নীলাভর বলে ক্যাফেতে যখন পৌছল সেখানে একটা টেবিলে নীলাভ আনমনে আছে। সামনে একটা কফি মাগ।

বেশ বুড়িয়েছে নীলাভ, ঝুলপির কাছে রুপালি রেখারা বয়েস দিচ্ছে, 'চোখে মোটা গ্লাসের চশমাটাও তার সঙ্গ দিচ্ছে।

সে তুলনায় চয়নিকা অন্তত দশ বছর কমিয়ে রেখেছে নিপুণতায়। সামনে আসতেই সেই অদ্ভুত আড়ষ্টতা। নীলাভর আগের মতোই বিহ্বলতা। একই রকম আছে চয়নিকা, সেই আকর্ষণীয়া।

ক'দিনের ছুটি তোমার? আর হঠাৎ এই তলব?

এমনি দেখতে ইচ্ছা করছিল। গোপা চলে গেল বিনা নোটিশে খানেক হলো। গোপা মানে নীলাভর স্ত্রী! চমকে উঠল চয়নিকা। গলায় গল্প বলার ঢঙে বলছে নীলাভ, ছেলেটা মায়ের বেশি ভক্ত আমার মতো কাঠখোট্টা মানুষকে আর কে পছন্দ করবে বলো, এ

শুনল চয়নিকা। হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর যেমন ভাবে বলে, ঠিক সেরকম ভাবে নীলাভ বলে উঠল, তোমার কোনো সন্তান নেই চয়নিকা?

একটাই মেয়ে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে, তিন্নি।

আমারও খুব মেয়ের শখ ছিল জানো।

ভিতরে ভিতরে উদ্বেগটা মাথাচাড়া দিচ্ছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে চয়নিকার। নীলাভ কোনোদিন জানবে না তিন্নি আসলে ওরই সন্তান। কোনোদিন না, কিছুতেই না।

সেই বিকালের পর মাত্র দু'মাসের মধ্যে টের পেয়েছিল নিজের গর্ভে ভ্রূণের উপস্থিতি। না, চয়নিকা নিশ্চিত তিন্নি তন্ময়ের ঔরসজাত নয়। তন্ময়ও ঠিক ক্যালকুলেট করতে পারেনি হয়তো, শুধু চয়নিকা জানে। নীলাভর থুতনির এই নিখুঁত ভাজটা তিন্নির মুখে স্পষ্ট।

ছেলের গল্পই বেশি করল নীলাভ। ফিরে আসার সময় শুধু একটা কথাই বলল ও, মাঝে সাঝে যোগাযোগ করো চয়নিকা, একেবারে ভুলে যেওনা।

(১৬)

না না করে বন্ধুত্বটা হয়েই গেল নীলাদ্রি আর তমালিকার। বেশ মিশুকে ছেলে নীলাদ্রি। তিন্নির সাথে অনর্গল কথা বলে গেল ফেরার পথে। ফোন নম্বর আদান প্রাদানও হলো। শুধু কি বন্ধুত্ব? নাকি ওরা দু'জনেই বন্ধুত্বের সম্পর্কের বাইরে গিয়ে স্থাপন করতে চাইছে আরো গভীর একটা নাম না জানা সম্পর্ক।

(১৭)

কুয়াশা ঘেরা রাস্তার একটা নিজস্ব রহস্যময়তা আছে, তিনহাত দূরের মানুষ হয়ে যায় অচেনা। পরিচিত মানুষও ঢেকে যায় অপরিচিতের আড়ালে। তন্ময়ের সংসারটা যেন সবসময়ই শীতের কুয়াশার চাদরে ঢাকা,

সে আবরণের গাঢ় পরদা সরানো তন্ময়ের সাধ্যের বাইরে। গতকাল থেকেই চয়নিকা এতটাই অন্যমনস্ক রয়েছে যে ফোনে তিন্নির সাথে করে কথাও বলল না। রহস্যময়ী চয়নিকার মনের হদিস কোনো পায়নি তন্ময়। তবে তিন্নিকে ভীষণ মিস করে তন্ময়। বড়ো বাপ মেয়ে।

(১৮)

এই নীলাদ্রি ছেলেটার সাথে পরিচয় হবার পর থেকেই তিন্নির একটা অদ্ভুত শূন্যতা তৈরি হয়েছে, একটা অচেনা মন খারাপের হাত ছেলেটা মিশুকে হলেও ওর চোখদুটোতে লুকিয়ে রয়েছে শেষ বিকে বিষণ্ণতা। যেটাকে ও আপ্রাণ ঢাকা দেবার চেষ্টা করে। এমনকি নি সম্পর্কে বলেও খুব কম।

নীলাদ্রির কথা ভাবতে ভাবেতেই ট্যাক্সিটা বাড়ির দরজায় হর্ন দিল। বাজাতেই সন্ধ্যা মাসি দরজা খুলল। তিন্নি জানে এই সময়ে বাবা কেউই বাড়িতে থাকবে না কিন্তু ভিতরে ঢুকেই অবাক! ওর পরিপা বড্ড অগোছালো ভাবে শুয়ে আছে। তিন্নি আসতেই যেন প্রাণ পেল চয়নিকা। তিন্নি অবাক, মা কোনোদিন এত কথা একসাথে বলে

(১৯)

হঠাৎ রাস্তায় রায়নাকে দেখে নিজেরই কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল অয় একজনের বাইকে বড্ড বিশ্রি ভাবে বসে আছে রায়না। মাঝে মাঝে লেখার মতো ওর চোখ দুটোও অন্ধ হয়ে যায়, ঠিক সেই সময় ব আগুনে নিজের সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আজ বহুদিন পর আগের অয়ন ফিরে যায় বহ্নির কাছে। বহ্নিও বোধহয় আর অকা কারণ জানতে চায়নি, কাছে টেনে নেয় চির চেনা অয়নকে।

(২০)

আর মাত্র একসপ্তাহ বাকি আছে তিন্নির জন্মদিনের। তন্ময় অফিসের বেশ কিছু কলিগকে নিমন্ত্রণ করে প্রতিবছরই। এবারে নতুন পিএ বহ্নি আর ওর হাজবেন্ডকেও নিমন্ত্রণ জানালো। চয়নিকার কলেজের কয়েকজন আসেন বাদ বাকি তিন্নির বন্ধু।

(২১)

কয়েকদিন ধরেই নীলাভর পুরোনো দিনে ফিরে যেতে মন চাইছে। চয়নিকা যেন সেই আগের মতোই আছে। নিজের ছেলে নীলাদ্রিকে আজকাল বড়ো অচেনা মনে হয় বাবা হয়ে। অন্যমনস্ক, কল্পনার জগতে বিচরণ করে যেন। আজ বিকালে একটা মিস্টি মেয়ে এসে তার জন্মদিনে নীল আর ওকে আমন্ত্রণ করে গেল। আঙ্কেল বলে কি মিষ্টি করে ডাকছিল, এই ক'দিনে নীলের যে কলকাতায় বান্ধবী হয়ে গেছে কে জানতো! ঠোঁটের কোণে একটা দুষ্টু হাসি খেলে যায় নীলাভর।

(২২)

জন্মদিনের দিন সকাল থেকেই চয়নিকার ব্যস্ততার সীমা নেই। কিছুটা যেন নিজেকে আড়াল করার জন্যই এই ব্যস্ততা। মায়ের কথা শুনে তমালিকা আজ একটা আকাশনীল শাড়ি পরেছে। নিজেই মুগ্ধ হলো নিজের অবয়ব দেখে।

দরজাটা খুলেই চমকে উঠল চয়নিকা, নীলাভ আজ এ বাড়িতে? ভয়ে গলা শুকিয়ে যাবার জোগাড় চয়নিকার। কিছু বলার আগেই উচ্ছ্বল তিন্নি এসে আঙ্কেল আর ছেলে নীলাদ্রিকে সাদরে ভিতরে নিয়ে এল। বহ্নি আর অয়নও খানিক আশ্চর্য হলো দাদা আর ভাইপোকে এখানের

পার্টিতে দেখে। তিন্নিই পরিচয় করিয়ে দিল, নীলাদ্রির সাথে মন্দারমণি বন্ধুত্ব হবার গল্পটিও গোচরে আনলো।

তন্ময় বেশ সহজভাবেই কথা বলছে ওদের সাথে। তমালিকা চয়নিকার মেয়ে? সত্যিই পৃথিবীটা বড়ো ছোট।

প্রমাদ গুনল চয়নিকা। নীলাদ্রি তিন্নির ঠিক কেমন বন্ধু এর উত্তর খুঁজতে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে চয়নিকার মন। একটা অদম্য আক্রোশ চয়নিকার মনে। নীলাভর উপস্থিতি ও কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। ওর এই বাঁচার আলোর রেখা তিন্নিকেও কি পর করে দেবে নীলাভ? তিন্নি কি কে ঘৃণা করবে? ছোট্ট তিন্নির কচি হাতগুলোর স্পর্শ অনুভব করল চয়নিকা আজ ওর ১৯ বছরের জন্মদিনে। বাঁচতে চায় চয়নিকা একজন মা হয়ে তন্ময় বা নীলাভ নয় শুধু তিন্নিকে আগলে রাখতে চায় ও। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের উপস্থিতি, চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে কি ভীষণ মানসিক দ্বন্ধ চলছে চয়নিকার মনে। শুধু একটা বিকেলের ক্ষণিকের দুর্বলতা কি ওর এত বছরের তিলতিল করে সযত্নে গড়ে তোলা বাগানটা তছনচ করে দেবে?

(২৩)

এই বন্ধুত্ব আর কোনো সম্পর্কের দিকে এগোতেই পারে না, কিন্তু না। কথাগুলো নিজের কানেই বড্ড অচেনা লাগল। নিস্তেজ লাগছে চয়নিকার শরীর, চোখের সামনে তিন্নি, নীলাভ, তন্ময়, নীলাদ্রির মুখগুলো মিশে গিয়ে একটাই অবয়ব সৃষ্টি করছে সেটা ওর নিজের। নিজের পরিচিত মুখটাতে আজ অসংখ্য বলিরেখার ছায়া।

মধুচন্দ্রিমা

তোমার শোয়ার অভ্যাসটা বড্ড খারাপ। ফুটবলের মতো গোটা বিছানায় ঘুরপাক খাচ্ছিলে কেন?

বাসর ঘর থেকে বেরিয়েই কুনাল বিরক্ত মুখে তাকালো গিনির মুখের দিকে। গিনিও ঝাঁজি গলায় বলল, নিচেও তো অন্য বন্ধু-বান্ধবরা শুয়েছিল তুমি ওদের কাছে গিয়ে ঘুমোলেই পারতে! আমি তো তোমাকে আহ্লাদ করে বলিনি, ওগো আমার জীবনসঙ্গী, তুমি আমার পাশেই এসে শোবে!

একে তো সারারাত গিনির লাথি ঘুষি খেয়ে ঘুমের বারোটা বেজে গেছে, তারপর কোথায় গিনি দুঃখ প্রকাশ করবে তা নয়, নতুন বৌয়ের কী মুখের বহর!

অথচ মা বলেছিল, ও মেয়ে নাকি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!

এ তো রীতিমতো বাড়িতে ডেকে এনে অপমান।

গিনি বলছে, দেখো ওটা আমার ঘর, আমার ডিভান, আমি উদার মানুষ তাই তোমাকে এক্সকিউজ করে জায়গা দিয়েছিলাম। আজ অব্দি আমার ডিভানে কাউকে এলাউ করিনি।

এবার কুনালের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, ভেবেছে কী মেয়েটা! ওর নিজের কোনো ঘর নেই, নাকি পার্সোনাল ডিভান নেই!

গিনি হাই তুলে বলল, শোনো তোমার ডিওর ব্রান্ডটা চেঞ্জ করে নিও। এই তীব্র গন্ধটা আমার মোটেই ভালো লাগে না।

কুনালের ইচ্ছে করছে টেনে একটা থাপ্পড় লাগাতে। তবে এ যা মেয়ে একটা থাপ্পড়ের বদলে হয়তো চারটে মারবে।

ছোটোপিসি বলেছিল, ছোট্ট থেকে নাকি ও গিনিকে চেনে, এমন ভালো মনের মেয়ে আর দুটো পাওয়া যাবে না। বাড়ি শুদ্ধু লোক যদি কুনালের ভালো মানুষির সুযোগ নেয় তাহলে আর ওর একার পক্ষে কী করা সম্ভব। শেষ পর্যন্ত একটা অহংকারী মুখরা মেয়ের সাথে ওর বিয়ে দিল, হ্যাঁ গিনির মাথায় এখনো কাল রাতের কুনালের দেওয়া সিঁদুর টকটক করছে।

গিনির আপাতত পরনে রয়েছে, একটা থ্রি কোয়াটার প্যান্ট, আর একটা টিশার্ট। আদুরী আদুরী মুখ করে বলল, তুমি আগে ওয়াশ রুমে ঢুকবে না আমি?

কুনাল বিরক্ত মুখে বলল, আমি আগে।

গিনি নাকটা সিটকে বলল, জানতাম! তুমি বুর্জুয়া শ্রেণীতেই পড়ো। যাও যাও...

বন্ধুদের কাছে শোনা নতুন বৌয়ের লজ্জা অবনত মুখটার সাথে গিনির তুলনা করতে গিয়েই মাইগ্রেনের যন্ত্রণাটা জানান দিয়ে বলল, এই তো সবে শুরু বন্ধু... আগে আগে দেখো হোতা হ্যায় কেয়া!

কুনাল মনের আনন্দে সবে একটু গায়ে জল ঢালতে লেগেছে ওমনি গিনি এসে বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, আরে তুমি কি সারা সকালটা একাই বাথরুমে কাটাবে?

কুনাল উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করল না কিন্তু ও মেয়ে চুপ করার নয়। আমার বাথরুমে এতক্ষণ ধরে তুমি কি করছো? পরের পেয়ে নিশ্চয় আমার দামি শ্যাম্পু আর বডিওয়াসের বারোটা বাজাচ্ছ।

কুনাল রেগে গিয়ে টাওয়েল পরেই বাইরে বেরিয়ে এসেছে, কি ভেবেছো টা কি তুমি গিনি? তোমার ওই লেডিস শ্যাম্পু ব্যবহারের লোভে আমি এতক্ষণ বাথরুমে ছিলাম?

গিনি মুখটা ভেংচি কেটে বাথরুমে ঢোকার সময়ে বলে গেল, বিয়ে বাড়ির সব লোক জেগে গেছে এখন। সবাই নতুন বরকে টাওয়েল পরে দেখবে, কী মজা।

যা, কুনালের সব পোশাক তো বাথরুমে! গিনি বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন ওকে নরম নরম গলায় অনুরোধ করা ছাড়া কুণালের আর কোনো উপায় নেই।

কুনাল আস্তে আস্তে বলল, গিনি এখন তো আমি তোমার স্বামী, মানে হাবি তাই তুমি নিশ্চয় চাও না তোমার হাবির সম্মানহানি হোক।

গিনি মনে মনে একচোট হেসে নিয়ে বলল, নিশ্চয় না।

বাথরুমের দরজাটা আধফাঁক করে কুণালের পায়জামা আর পাঞ্জাবি বের করে দেবার সময় গিনি বলল, এই সফ্ট সুরে কথা বলো, এটাই আমার পছন্দের।

কুনাল ঘড়ি দেখল, বিদায় পর্ব মিটিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরতে মাত্র দু'ঘণ্টা লাগবে, তারপর এই গিনি চৌধুরীর তেজ যদি না কমাতে পেরেছি তো আমার নামও কুনাল সেন নয়।

গিনিকে আবার গয়না আর বেনারসীতে সাজানো হয়েছে।

মুখটা কেমন একটু দুঃখী দুঃখী লাগছে। সকালের সেই প্রাণচঞ্চল মেয়েটাই নয় যেন।

গিনির বাবা রঞ্জনবাবু সামনে আসতেই গিনি অঝোরে কেঁদে ফেলল। নিজের ঠোঁট কামড়ে কান্না চাপার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে ও কিন্তু নোনতা জলের ধারারা আজ অবাধ্য হয়ে ঝড়ে পড়ছে ওর গোলাপী গাল বেয়ে।

কুনাল অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে গিনির দিকে। কাল রাত থেকে দেখা মেয়েটার মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত পরিবর্তন। ওর চোখের জল হয়তো আস্তে আস্তে কুনালকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

অবশেষে রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতেই গিনি গাড়িতে উঠল। শ্বশুরবাড়ি যাত্রার উদ্দেশে। এত নিয়মের বেড়াজাল থেকে রেহাই পেয়ে কুনাল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। গাড়ির এসিটা চালিয়ে চোখটা বন্ধ করে বসল। পাশের জন তখনও চোখ মুছে আর নাক টেনে চলেছে বলে একটু অস্বস্তি হচ্ছে।

কুনাল মাথাটা তুলে বলল, এভাবে কাঁদার কী আছে, একঘণ্টার রাস্তা যেকোনো সময় চলে এসো তোমার বাড়িতে।

তখনও চোখে জল টলটল করছে, সেই নিয়েই ঝেঁজে উঠল গিনি, আর কি বুঝবে! নিজের ঘর, নিজের বাবা, মা, এদের ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয়। আমার টেডিগুলোকেও তো মিস করছি।

কুনাল আস্তে করে বলল, আর তোমার ঐ মহামূল্যবান ডিভানটা

কুনালের চোখের দিকে গভীর ভাবে তাকিয়ে বোধহয় বুঝে নিতে গিনি, আদৌ কথাটা ব্যাঙ্গাত্মক কি না। কুনাল যতটা সম্ভব মুখটাকে নি রাখার চেষ্টা করেছিল বলেই এ যাত্রা বেঁচে গেল।

গোটা গাড়ি জার্নিটা ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়েই কাটিয়ে দিলো গিনি। মাঝে মাঝে আড় চোখে তাকাচ্ছিল।

বাড়ির গেটের সামনে যখন বৌ নিয়ে পৌঁছালো তখন সকাল এগারো বিয়ে বাড়ির সাথে একটা জিনিসের তুলনা চলে সেটা হলো মাছের বাজা এখানেও সবাই বলছে কিন্তু কেউ শুনছে না।

কুনালের মা এসে নতুন বৌকে বরণ করতে শুরু করলেন। গিনির কো একটা জল ভরা ঘড়া আর হাতে জ্যান্ত মাছ। গিনি নাজেহাল হয়ে যা সিল্কের শাড়ি থেকে ঘড়া আরেকটু হলেই হড়কে যাচ্ছিল, কুনাল সা দিলো তাই ওটা পড়ল না। গিনির ঘর্মাক্ত মুখটা দেখে সকালের রাগটা আ আসতে কমছে কুনালের।

অনেক নিয়ম কানুন মিটিয়ে অবশেষে কুনাল আর গিনি বেডরুমে ঢুক গয়না গাটি খুলতে খুলতেই গিনি বলল, নট ব্যাড।

ভ্রূ কুঁচকে নিজের পছন্দের কুশনটা কোলে নিয়ে সোফায় হেলান দি কুনাল বলল, কোনটা নট ব্যাড?

গিনি বলল, এই তোমার বেড রুমটা। আমার মতো না হলেও আমি চা নেবো।

ব্যাস, যেমনি সকলের চোখের আড়াল হয়েছে তেমনি গিনি সেই সকা রূপ ধরেছে।

কুনালের ওয়ার্ডরবটা খুলে ফেলে ওর শার্টপ্যান্ট সরিয়ে নিজের পোশা

দেখতে ব্যস্ত। ওকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনও মনে করল না।
প্রথম দিন থেকে ভদ্রতার খাতিরে সহ্য করে চলেছে গিনির এই অত্যাচার।
কোনো ভূমিকা ছাড়াই গিনি বলল, একটা পরিষ্কার কথা বলে দিই, আমার উপর বৌয়ের অধিকার ফলাতে আসবে না।

সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে কুনাল বলল, আমি পিসিমনির কথায় বিশ্বাস করে তোমাকে বিয়ে করেছিলাম, কিন্তু একদিনেই সে মোহ কেটে গেছে। তাই নিশ্চিন্তে আমার ঘরে তুমি থাকতে পারো। এরপরও গিনি নাকটা কুঁচকে বলল, তোমাকে ভদ্রলোক ভেবে কথাটাতে আস্থা রাখলাম।

উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কুনাল।

না, লোকটা খুব একটা খারাপ নয়। কুনালের পিসিমনি মানে দোলন পিসি। ছোট থেকেই ওদের বাড়িতে যাতায়াত আন্টির। যদিও গিনি ওকে আন্টি বলেই ডাকে। গিনিকে কুনালের সম্পর্কে বলা হয়েছিল, উদারমনস্ক ছেলে। কাল থেকে তো উদারতার বিন্দু বিসর্গও চোখে পড়ল না ওর। সব সময় কেমন একটা নাক উঁচু, নাক উঁচু ভাব। যাকগে ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করলেই হবে।

তবে কুনালের বাবা মাকে ওর বেশ পছন্দ হয়েছে। ওর বাবা তো গিনির কানে কানে বলল, যদি কুনাল কোনো গন্ডগোল করে ওনার কাছে শুধু একটা নালিশ ঠুকে দিলেই চলবে। বাবাকে দেখে প্রথমেই গিনির অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের কথা মনে পড়ছিল। শুধু ঠোঁটের ডগায় চুরুটের অভাব ছিল একটা। কিন্তু পরে বুঝল, ঐ ব্যক্তির ভিতরে একটা শিশুর মতোই সরল মানুষের উপস্থিতি। কুনালের মা তো নেহাতই সাদাসিধে। ছেলে আর স্বামীর কথায় চলতি পুতুল বিশেষ। ছেলে আর স্বামী দু'জনকে সমর্থন করতে করতে বেচারির অবস্থা অনেকটা স্যান্ডুইচের মতো।

ফুলশয্যার দিন গিনিকে ছোঁয়া যাবে না সেটা কুনাল আগেই বুঝতে পেরেছিল। পরের দিন বন্ধুদের কাছে নিজের পাঞ্জাবিতে বাংলা সিরিয়ালের কাহিনীর মতোই লিপস্টিক বা সিঁদুর লাগিয়ে প্রমাণ করতে হবে ফুলশয্যায়

রোমান্স জমে উঠেছিল। পার্সোনাল বিষয়ে মানুষের এই অতিরিক্ত কৌতূহল বিরক্তি লাগলেও, নতুন বরকে অনেককিছু সহ্য করতে হয়। সহ্য যে করতে হয় সেটা তো এই দু'দিনে গিনির ব্যবহারেই বুঝতে পেরেছে। আশ্চর্য মেয়ে একখানা, বাবা-মা, বাড়ি শুদ্ধু আত্মীয়ের সাথে দারুণ ব্যবহার আর কুনালের সাথে কথা বলতে হলেই মনে হচ্ছে মুখে কেউ নিমপাতা ভরে দিয়েছে। কুনালকে যদি এতই অপছন্দ ছিল তাহলে বিয়েটা করতে গেল কেন?

আবহাওয়ার মতো মুড পরিবর্তন হয় এই মেয়ের। ফুলশয্যার সাজানো বিছানায় শুয়ে বলল, তুমিও আমার পাশেই শুতে পারো। আমি ভদ্রলোকজনের সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করি না। বিষাক্ত মন নিয়ে কুনাল গিনির পাশে শুয়ে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ পর পেটের কাছে একটা সজোরে লাথি খেয়ে চমকে উঠল ও। যা ভেবেছে ঠিক তাই, গিনি ঘুমের ঘোরে সম্পূর্ণ উলটে গেছে।

ঘুমন্ত গিনির মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বালিশটা নিয়ে সোফায় শুয়ে পড়ল ও।

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখল একটু লজ্জিত মুখে গিনি হাতে চায়ের কাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বোধহয় ঘুমের মধ্যে শট মেরে ছিলাম, তাই না? কুনাল বলল, তুমি ঘুমের ঘোরেও আমার ওপর রিভেঞ্জ নিতে চাইছো?

সরি, বলে ছুটে বেড়িয়ে গেল ও।

অফিস যাবার আগে দেখল গিনি আর বাবা খুব হাসছে, কিছু একটা প্ল্যান করছে মনে হয়। বাবা গম্ভীর গলায় বলল, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরো, অফিস ফিরত আগের মতো আর ক্লাবে ঢুঁ মারতে যেও না।

এ বাড়িতে কুনালের মিনিমাম সম্মানটুকু যেন গিনি এসে কেড়ে নিলো। গিনির সামনেই বাবা এমন ভাবে কথা বলছে, যেন প্রাইমারীর বাচ্চাকে কেউ বলছে, স্কুলে পটি পেলে ঠিক করে প্যান্টটা খুলো। একটা বিয়ে করে যে মানুষের জীবনে এত পরিবর্তন আসে তা কুনাল কল্পনাই করতে পারেনি।

মাত্র দু'দিন ওদের বাড়িতে ঢুকে পুরো বাড়িটাকে নিজের বৈঠকখানা বানিয়ে নিয়েছে গিনি। বাবা-মাও এখন গিনি বলতে ঢোক গিলছে। অসহ্য হয়ে উঠেছে ওর কাছে।

অফিসে গিয়েও বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল, মুখার্জ্জীদা রসিকতা করে বললেন, কি হে, নতুন বৌয়ের শ্রীমুখ সর্বদা চোখের সামনে ভাসছে বুঝি?

এই প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চুপ থেকে দন্তবিকশিত করা ছাড়া আর উপায়ই বা কী।

বাড়িতে ঢুকেই বুঝল সবাই ওর ফেরার অপেক্ষায় ছিল, ওর না ওর গাড়িটার সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ। গিনি বলল, চটপট হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও। টেবিল বুক করা আছে, আজ বাইরে ডিনার।

বলছে কি মেয়েটা! বাবা যাবে বাইরে ডিনার করতে? চাকরিতে জয়েন করার পর কুনাল বাবা-মাকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে যেতে চেয়েছিল সেলিব্রেট করতে। বাবার বলা কথাটা আজও কুনালের মনে গেঁথে আছে। কষ্ট করে পড়াশোনা শিখিয়েছি, জব পাবে এটাই তো স্বাভাবিক, এতে অকারণে লাফানোর কী আছে। নিমেষে ইচ্ছেটা চুপসে গিয়েছিল। আজ সেই বাবা যাচ্ছে বাইরে ডিনার করতে। মাও তো বেশ সেজেগুজে রেডি। মার নাকি হাবিজাবি খেলেই আসিডিটি হয়, আজ বোধহয় সেসব ভুলেছে।

যাইহোক মেজরিটি অলওয়েজ গ্রান্টেড মেনে নিয়েই কুনাল গাড়িতে উঠল। গিনি সারা রাস্তা বাবা-মায়ের সাথে বকবক করতে করতে চলেছে। যাক এটা কুনালের সৌভাগ্য যে বাবার অট্টহাসির আওয়াজটা এই একত্রিশে এসে অন্তত শুনতে পেল।

টেবিলে বসে কুনাল প্রথমেই বলল, সবাই আজ চাইনিজ খেলে কেমন হয়?

গিনির চটজলদি উত্তর, যে যার নিজের পছন্দ মতো খাবার পছন্দ করুক। মা বলল, কুনাল বা ওর বাবা যা নেবে সেটাই আমি খাবো।

গিনি প্রতিবাদ করে বলল, কেন মা... আপনার নিজের পছন্দ বলে কিছু

নেই। ছেলে আর স্বামীর পছন্দকে কেন সবসময় নিজের পছন্দ করে নিয়ে...

মা বোধহয় তেত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে এমন অদ্ভুত কথা এই... শুনলেন, তাই অস্বস্তি ভরা মুখে তাকিয়ে রইলেন বাবার দিকে। বাবাও স... পড়েছে, এতদিন পর্যন্ত তো মানসী ওর কথা মতোই চলেছে, ফলে নি... মতামত দেবার ক্ষমতাটাও বোধহয় হারিয়ে ফেলেছে। আজ গিনির স... সেটা স্বীকার করার ক্ষমতা আর বাবার নেই।

মা হঠাৎ একমুখ হেসে বলে উঠল, আচ্ছা এখানে ডাব চিংড়ি পা... যায়?

এই প্রথম মা নিজের ইচ্ছে জানাল সকলের সামনে। কুনাল ছেলে হ... জানতে পারেনি ডাব চিংড়ি মায়ের পছন্দের কোনো খাবার। আসলে মায়ে... যে আলাদা কোনো পছন্দ থাকতে পারে সেটাই তো কুনাল বুঝতে পা... কোনোদিন।

খাওয়া দাওয়া যখন প্রায় কমপ্লিট তখন গিনি বলল, একটা পার্সেল হ...

বাকি তিনজনের কৌতূহলকে বেশিক্ষণ স্টে করতে না দিয়েই বলল, রী... মাসির জন্য।

রীতা মাসি হলো কুনালদের বাড়ির সবসময়ের কাজের লোক।

গিনি বলল, আসলে রীতা মাসিকেও আমি আনতে চেয়েছিলাম, কি... এত লাজুক যে কিছুতেই আসতে চাইল না। আমাদের জন্য না ঘুমিয়ে অপে... করবে দরজা খোলার জন্য।

গিনি এমন ভাবে নিজের সিদ্ধান্ত জানায় যে ওর ওপরে আর কারুর ক... চলে না।

আজ অনেকদিন পর কুনাল নিজের বাবা কৈলাস সেনের এত হাসি খু... মুখ দেখল।

•

সাধারণত এত ভোরে ঘুম ভাঙে না কুনালের। ঘুম ভাঙতেই দেখল, গি... ...রোর সাথে খুব ফিসফিস করে কথা বলে চলেছে। কিছু একটা টাকা, গ...

নিয়ে। কুনালকে চোখ মেলতে দেখেই চুপ করে গেল।

এতদিন কুনাল মনে করেছিল, বড়লোকের আদুরী মেয়ের মনমর্জি, তাই কুনালকে এখনো ধারে কাছে যেতে দেয়নি, কিন্তু আজ পরিষ্কার বুঝতে পারল গিনি অন্য কাউকে ভালোবাসে।

ভোরের সোনালী সূর্যের দিকে তাকিয়ে কুনালের মনটা হুহু করে উঠল।

আদৌ কি এই ক'দিনে ও গিনিকে একটুও চিনতে পেরেছে! গিনির হাতে কুনালের চায়ের কাপ। গরম চা থেকে ধোঁয়া উঠছে।

গিনির মুখটা নরম আলোয় বড় পবিত্র লাগছে। কুনাল অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে গিনির দিকে। এমন একটা নিষ্পাপ মুখের আড়ালে একজন প্রবঞ্চককে খুঁজে বেড়াতে ইচ্ছে করছে না কুনালের।

গিনি হালকা সবুজ চুড়িদারের ওড়না সামলে বেরিয়ে গেল।

খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে কুনাল ভাবছিল, আর মাত্র তিনদিন পর ওদের হানিমুনের টিকিট।

মধুচন্দ্রিমা! গ্যাংটকের টিকিট দুটো টেবিলের ওপর থেকে বিদ্রুপের হাসি হাসছে।

গিনির মতো প্রতিবাদী মেয়ে হঠাৎ নিজের মনের বিরুদ্ধে কেন কুনালকে বিয়ে করল সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না।

একটা সময়ের পর ভাবনারাও ক্লান্ত হয়ে যায়, মাথার মধ্যে শিরা-উপশিরাগুলো বুঝিয়ে দেয় তারা অবসন্ন বোধ করছে।

ট্রলি ব্যাগের পেটটা ফুলে উঠেছে। গিনি তারপরেও ঠুসে ঠুসে আরো পোশাক ঢুকিয়ে যাচ্ছে দেখে কুনাল বলল, গ্যাংটকে থাকা মাত্র চারদিন। এত জামাকাপড় কী হবে?

গিনি মুখ ভেংচে বলল, দু'বেলা দুটো করে পরলেও তো আটটা লাগবে। কুনালের সত্যিই পাগল পাগল অবস্থা। কখনো গিনি ভীষণ সরল সাদামাটা একটা মেয়ে আবার কখনো যেন ধূসর আবরণে ঢাকা রহস্যময়ী! একজন মানুষের মধ্যে সমানভাবে দুটো রূপই বর্তমান। অষ্টমঙ্গলায় নিজের বাড়ি গিয়ে

গিনি সকলের কাছে কুনালের বাবা-মায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যদিও কুনাল প্রসঙ্গ উঠলেই খুব আলতো করে সেটা স্বেচ্ছায় এড়িয়ে গেছে। শুধু বিকালের দিকে গিনিকে সারা বাড়ি, ছাদ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল শেষে গিনির মা বললেন, মনে হয় বন্ধুর বাড়িতে গেছে। গিনির এই বন্ধুটি যে কে সেটা কুনাল জানতে পারেনি। সত্যি বলতে কি আর জানার কৌতূহলও নেই।

গ্যাংটক স্টেশনে নামার পর থেকেই গিনির পরিবর্তনটা চোখ এড়ায় না কুনালের। অন্যমনস্ক গিনি বারবার নিজের মোবাইলের কল লিস্ট চেক করছে। হয়তো সম্ভাব্য কলটা আসতে দেরি হচ্ছে বলেই।

গাড়িতে উঠেই ফোনের কোনো একটা মেসেজ দেখার পর থেকেই আর ঠোঁটের কোণায় হাসি উপচে পড়েছে।

কুনাল বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। নিউজলপাইগুড়ি ছেড়ে বেরোতেই রাস্তার দু'ধারে লম্বা লম্বা গাছের সারি আর একটা আলো আঁধারির লুকোচুরি খেলা চলছে।

মাটিতে পাহাড়ি গন্ধটা পেতে শুরু করেছে গিনি। কুনালকে তো বলেনি যে ও পাহাড় পছন্দ করে। পাহাড়ের প্রতিটা বাঁকের পিছনে যে অপার রহস্য লুকিয়ে থাকে সেটাই বারবার ডাক দেয় গিনিকে।

কুনালের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে গিনি। না দোলন আন্টি কিছু বলেনি। কুনাল সত্যি খুব ভালো ছেলে। এখনো পর্যন্ত গিনি যা যা অত্যাচার করেছে সেগুলো সব হাসি মুখে না হোক মেনে নিয়েছে। গিনির না বলা কথাগুলো বোঝার চেষ্টাও করে চলেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে কুনাল। গাড়ির ঝাঁকুনিতে মাথাটা বারবার এদিক ওদিক হচ্ছে দেখে গিনি আস্তে করে নিজের কাঁধে সাপোর্ট দিল।

কুনালের ট্রিম করা দাড়ি গিনির গালে ঘষে যাচ্ছে। ওর আফটার শেভের গন্ধটা গিনির নাকে এসে ঝাপটা দিচ্ছে। এই ক'দিন এক বিছানায় পাশাপাশি

শুয়ে থেকেছে গিনি আর কুনাল, মাঝে পাশবালিশের একটা পলকা ব্যবধান ছিল। কুনাল কোনোদিন সেটা টপকাতে চেষ্টাও করেনি। যেহেতু গিনি প্রথম দিনেই বলে দিয়েছিল, "আমাকে ছোঁবে না"। ওর প্রতি কুনালের এই নিস্পৃহতা আর ভালো লাগছে না গিনির কিন্তু নিজের বলা কথা আর ও ফিরিয়েও নিতে পারছে না। ওর ঈষৎ সোনালী চুলগুলো থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ গিনিকে অবশ করে দিচ্ছে। বারবার মনে হচ্ছে এই গাড়ির পথটা আরো লম্বা হোক, আরো কিছুক্ষণ কুনাল এভাবেই ঘুমুক।

গিনির কাঁধ থেকে চট করে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গিনির দিকে লজ্জিত ভাবে তাকিয়ে কুনাল বলল, সরি।

এতক্ষণের সব ভালোলাগাটুকু নিমেষে চলে গেল গিনির। এতটা পর ভাবে কুনাল ওকে! হয়তো সেটা ওর ব্যবহারের জন্যই।

হোটেলে ঢুকেই গিনি বলল, বিকেলের আগে কোথাও বেরুবো না। কুনালের তো কোনোমতে ওই চারটেদিন কেটে গেলেই হলো। মধুচন্দ্রিমার জন্য একটা ভালো গল্প বানাতে হবে যেটা কলিগদের কাছে বেশ রঙচড়িয়ে বলে প্রমাণ করতে হবে ওদের হানিমুন কতো মধুর কেটেছে। একটা হালকা গোলাপী টপ আর ব্ল্যাক লং স্কার্ট পরে গিনি যখন ভিজে চুলে বাথরুম থেকে বেরুলো তখন ইচ্ছে করেই কুনাল নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে হোটেলের মেনুকার্ডে মনোনিবেশ করল।

সন্ধ্যেবেলা সব ভুলে গিনি আর কুনাল ম্যালের রাস্তায় আর পাঁচটা হানিমুন কাপলের মতোই হাঁটল। ঠান্ডায় জমে যেতে যেতে আইসক্রীম খেল। একটা স্বপ্নের সন্ধ্যা কাটানোর পরেই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গিনির সেই ফিসফিস কথা শুনবো না ভেবেও শুনতে হলো। খুব উদ্বিগ্ন গলায় গিনি কাউকে বলছে, ভালোবাসলে সব অসুখ সেরে যায়।

পাহাড়ের ধাপে ধাপে সন্ধ্যেপ্রদীপ জ্বলে উঠেছে। দূরে বাড়ির আলোগুলো যেন জোনাকির মতো মিটমিট করছে। পাশে শুয়ে গিনি অকাতরে ঘুমোচ্ছে। একটা নিষ্পাপ মুখ, চোখের ওপর এসে পড়ছে ওর অবাধ্য চুলের গোছা।

কুনাল সামনের কাচের জানলা দিয়ে অন্ধকারের আলোক বিন্দুর দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে।

রাত তখন বারোটা। গিনির ফোনটা আবার ভাইব্রেট করছে...

আজ বিকেলে ম্যালের ধারে বেশ কিছু বাচ্চার হাতে চকলেট দিচ্ছিল গিনি। বাচ্চাগুলো ভিক্ষা ভুলে শৈশবে মেতেছিল মুহূর্তের জন্য। গিনির চোখের কোণে তখন নোনতা জলের একটা রেখা দেখেছিল কুনাল।

আলগোছে গিনি বলেছিল, কুনাল তুমি রাগ করলে?

প্রথমে বুঝতে পারেনি কুনাল। ঠিক কী কারণে রাগ করবে! পরে বুঝেছিল গিনির ধারণা ঐ ভিক্ষে করা বাচ্চাগুলোর সাথে সময় কাটাচ্ছিল বলে কুনালের রাগ হয়েছে কিনা জানতে চাইছিল গিনি।

ওকে এতটা খারাপ মনের মানুষ মনে করে গিনি এটা ভেবেই কষ্ট হয়েছিল কুনালের। নীরবে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল, ও রাগ করেনি।

একবার কেটে যাওয়ার পরও আবার ভাইব্রেট করেছে ফোনটা। গিনি ঘুমোচ্ছে।

বারবার উঠছে রাহুল কলিং...

কুনাল ফোনটা রিসিভ করতেই ওপ্রান্তের ছেলেটি কিছু না শুনেই বলতে শুরু করল, গিনি পারলাম না রে, মিঠিকে বাঁচাতে। বাচ্চাটা চলে গেল আমাদের ছেড়ে। তোর দেওয়া গয়না বেচা টাকায় অপারেশনটাও হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কাল দুপুরের দিকে আবার ডিটোরিয়েট করল। ঘণ্টা খানেক আগেই, ছেলেটি কিছুই বলতে পারছে না আর, কান্নায় অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওর কথা।

কুনাল ফোনটা কেটে দিল।

সারারাত ছটফট করেছে কুনাল বিছানায় শুয়ে। কে ওই রাহুল? কার বাচ্চা মিঠি? গিনি কেন তার অপারেশনের জন্য গয়না বিক্রি করল?

এত প্রশ্নের ঘনঘটা নিয়ে ঘুমানো সম্ভব নয়। রাহুলের সাথে গিনির কি এমন সম্পর্ক? মিঠি কি রাহুল আর গিনির...

মাথাটা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে কুনালের। আর ভাবতে পারছে না ও। গি...

যা স্মার্ট তাতে বিয়ের আগে কারোর সাথে লিভ ইন করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

তাহলে হঠাৎ কুনালকে কেন এই প্রবঞ্চনা।

গুডমর্নিং বলে আড়মোড়া ভাঙল গিনি। চোখটা মেলে প্রথমেই হাত বাড়াল মোবাইলের দিকে।

কললিস্ট ব্ল্যাঙ্ক। গতকাল রাতে আসা কলটা ডিলিট করে দিয়েছে কুনাল।

তবে বাড়ি ফিরেই গিনির সাথে সামনা-সামনি কথা বলতে হবে। এত লুকোচুরি কুনালের কোনোদিনই পছন্দ নয়। ও বরাবরই জলের মতো স্বচ্ছ। তাই কলেজে স্বাতীর সাথে দু'মাসের প্রেমের ঘটনাটাও গিনিকে বলে দিয়েছিল বিয়ের আগেই। গিনি যদি মনে করে কুনালের কাছে নিজের জীবনের অন্ধকার দিকটা লুকিয়ে রেখে মুখোশ পরে সংসার করে যাবে, সেটা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়।

বাথরুমে ঢোকার আগে গুনগুন করে গান গাইছিল গিনি। অন্যদিন হলে গিনির মুড এত ভালো আছে দেখে কুনাল খুশি হতো কিন্তু কাল রাতের পর থেকে কোনো ভাবেই গিনির সামনে স্বাভাবিক হতে পারছে না কুনাল।

আবার গিনির ফোনটা বাজছে, রাহুলের ফোন...

ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে কুনাল।

গিনি বাথরুম থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েই ফোনটা ধরল।

কুনাল অপলক তাকিয়ে আছে গিনির দিকে। গিনি বোধহয় এই মুহূর্তে চাইছে কুনাল ব্যালকনিতে বেড়িয়ে যাক, একটু আড়াল চাইছে গিনি। কুনাল নির্বিকার, আজ সামনে বসেই দেখবে ওই মাঝরাতে ফোন করা রাহুলের সাথে গিনির ঠিক কী সম্পর্ক!

গিনি কোনো কথা বলছে না, শুধু ওর গোলাপি ঠোঁট দুটো তিরতির করে কাঁপছে আর দীঘল চোখ দুটো দিয়ে নোনতা জলের ধারা ওর গাল বেয়ে নেমে আসছে। চোখের জল মোছার কোনো তাগিদ অনুভব করছে না গিনি, সামনে যে কুনাল আছে সেটাও আর গ্রাহ্য করছে না। ফোনের ওপর প্রান্তে

কী বলছে একটু হলেও আঁচ করতে পারছে কুনাল, কিন্তু গিনি
নিশ্চুপ সেটাই বোঝার চেষ্টা করছে। মিঠি বলে যদি কেউ একজ
যায় সেটা যে গিনির কোনো কাছের আত্মীয় নয় সেটুকু ও নিশ্চি
দু'দিন আগেই কুনাল গিনিকে জিজ্ঞেস করেছিল, ওর কোনো নিক
বিপদে আছে কিনা! গিনি পরিষ্কার জানিয়েছিল, হঠাৎ এমন প্রশ্ন কে
করছে, ওর কোনো আত্মীয় অসুস্থ নয়। গিনির ঐ বিশেষ ফোনটা
বাইরে বেরিয়ে যাওয়াটাই কুনালের মনের প্রশ্নের উৎস।

গিনি বিছানার চাদরটা খামচে ধরে কেঁদে চলেছে।

হঠাৎ কুনালের বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল গিনি। এমনিতেই গি
প্রবাহের জাল বিস্তার করে কুনালের ভাবনা চিন্তাকে অবশ করে
তারপর এই আকস্মিক পরিবর্তনে ও সত্যিই হকচকিয়ে গেছে।

গিনি বিড়বিড় করে বলছে, পারলাম না কুনাল আমরা মিঠিকে
পারলাম না। মাত্র সাত বছরের একটা মিষ্টি মেয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে

'মিঠি কে?' এই প্রশ্নটা আপাতত কণ্ঠনালীর মধ্যেই জোর করে আ
রাখল ও।

কান্নার দমকে গিনির পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে। চোখের জলে কুনা
টি শার্ট-র অংশ ভিজে যাচ্ছে।

কুনাল আস্তে আস্তে বলল, আমাকে বলো গিনি। আমি যদি কোনো
করতে পারি।

যদি সত্যিই গিনি বাড়ির চাপে কুনালকে বিয়ে করে থাকে, যদি গি
রাহুলের সাথে থাকতে চায় তাহলে না হয় কুনালই পৌঁছে দেবে গিনি
রাহুলের কাছে।

গিনি চলে যাবে ভাবতেই একটা অচেনা অনুভূতি চিনচিন করে উ
হৃদয়ের কোনো গোপন স্থানে।

চোখ মুছে গিনি উঠে বসেছে।

কুনালের একটা হাত ধরে আছে এখনো।

কুনাল ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেনি।

পাহাড়ে রোদবৃষ্টির খেলা চলছে। রোদেলা আকাশে গুড়িগুড়ি বৃষ্টির ফোঁটারা পাথুরে মাটি ছুঁতে চাইছে।

দু'দিকে রঙিন রিবন বেঁধে পাহাড়ী মেয়েগুলো পিঠে ব্যাগ নিয়ে সাত সকালেই স্কুলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে। চড়াই রাস্তা ধরে সাবলীল ভাবে হেঁটে চলেছে, নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে বলতে।

নিষ্পাপ মুখগুলোর অনাবিল হাসির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গিনি। ঘরের একদিকের দেওয়াল জুড়ে লাগানো কাচ দিয়ে বাইরের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

গিনির দৃষ্টি আকর্ষণ করে কুনালও তাকিয়ে আছে অনামী পাহাড়ের রাস্তার দিকে। রাস্তার ধারে ধারে রঙিন পতাকা হাওয়ায় দুলছে ভারবিহীন ভাবে।

গিনি বলতে শুরু করল, গলার স্বরটা যেন কোন সুদূর থেকে ভেসে আসছে।

আমি যখন কলেজে পড়ি তখন থেকেই 'সানরাইজ'-এর সাথে যুক্ত। বাবা জানে না, কিন্তু মা জানতো।

সানরাইজ একটা এনজিও সংস্থা।

না, কোনো বড়সড় এনজিও নয়, সরকারি অনুদান পাবার মতো বৃহৎ কাজ সেখানে হয় না। কলেজের বেশ কিছু বন্ধুবান্ধবের নিজেদের পকেট মানি বাঁচিয়ে শুরু হয়েছিল সানরাইজ। বাকিটা চলছিল চাঁদা তুলে। থ্যালাসেমিয়ার বাচ্চাদের জন্য ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করাটাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কাজ করতে করতে দেখা গেল, থ্যালাসেমিয়ার মতো মহামারী রোগ আরো আছে। মিঠির যেমন ব্রেন টিউমার ছিল। আবার মুখে হাত চাপা দিয়ে কান্না চাপল গিনি। গলার আবেগ সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল ও।

সানরাইজ সবসময় চেষ্টা করেছে দুঃস্থ বাচ্চাদের পাশে দাঁড়াতে। বছর খানেক ধরে মিঠির জন্য আমরা টাকা জোগাড় করেছি, শেষ পর্যন্ত আমার আর অনন্যার, দু'জনের একটা করে সোনার গয়না পর্যন্ত বিক্রি করা হয়েছিল

ওর ট্রিটমেন্টের জন্য। বেস্ট সার্জেন ওকে অপারেট করেছিল তবুও...

কুনাল অবাক হয়ে শুনছে, একটা বদমেজাজী, মুডি মেয়ের জীবনের কথা। দোলন পিসির একটা কথা মনে পড়ে গেল কুনালের, শুধু নামে নয়, গিনি আসলে খাঁটি সোনা।

গিনি বলে চলেছে, রাহুল, বিকাশ, রতনদা, মোনালিসাদি সকলে বলেছিল, আমি হানিমুন থেকে ফিরে গিয়েই মিঠিকে সুস্থ দেখব।

গিনিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে কুনাল। ওর প্রতিটা নিঃশ্বাস মিশিয়ে নিচ্ছে নিজের রক্তে। কোনো এক অচেনা মিঠির জন্য কষ্ট হচ্ছে কুনালের।

ধীরে ধীরে বলল, আমার কাছে কেন লুকিয়ে ছিলে গিনি? আমাকে কি খুব নিষ্ঠুর মানুষ বলে মনে হয়েছে?

মাথাটা দু'দিকে নেড়ে গিনি বলল, মা বলেছিল বিয়ের পর আর এসব করলে শ্বশুরবাড়ির সকলে রাগ করবে।

ভাগ্যিস কুনালের মনটা গিনি দেখতে পায়নি। তাই কিছুক্ষণ আগেই ওকে নিয়ে ভাবা কদর্য রূপটা আড়াল করে গেছে অন্তত।

কুনাল বলল, যদিও আমি অপদার্থ, তবুও তোমাদের সানরাইজের নতুন সদস্যপদে আমার নাম বিবেচনা করা যায় কি?

টলটলে জল ভরা চোখে গিনি কুনালের দিকে তাকাল।

অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে আছে দেখে কুনাল বলল, স্বামী হিসাবে তো পাশ করতে পারিনি, তোমার কাজের সঙ্গী হিসাবেও কি গ্রহণীয় নয়?

গিনি কোনো কথা না বলে কুনালকে জড়িয়ে ধরেছে, এমন একজন জীবন সঙ্গীই সে চেয়েছিল মনপ্রাণ থেকে।

দূরের কোনো পাহাড়ী গ্রামের দেহাতি গানের সুরের আবছা শব্দ ভেসে আসছে ওদের ঘরে। বৃষ্টি ভেজা বুনো গাছের গন্ধে মাতাল হয়ে উঠেছে মধুচন্দ্রিমার বাতাস।

ভাড়াবাড়ির আত্মীয়রা

ফাল্গুনী সকালের নরম আলোর প্রথম রেখাটা এখন জানলার গ্রিলে এসে পড়েছে। কেমন একটা কুয়াশা কুয়াশা ঝাপশা আঁধার ছড়িয়ে আছে এখনো। শীত যেতে না যেতেই একটা উষ্ণ হাওয়ার আবেশ ছড়িয়ে পড়েছে। এই সময়টা সন্ধের দিকে গরম ভাব, আর ভোরের দিকে একটা হালকা ঢাকা পেলে আয়েশি ঘুমের সুবিধা হয় গোছের ব্যাপার হয়েছে। ভোরের দিকেই ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল অনামিকার, পাশেই সুদীপ্ত জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে দেখে বেড কভারটা টেনে দিল ওর গায়ে।

ভোরে ওঠা ওর নিত্যদিনের অভ্যাস হয়ে গেছে। সকলের আগে টাইমকলের নীচে একটা বালতি পেতে লাইন দেওয়াটা ছিল নিত্যকাজের একটা। তখন থেকেই এই সময় মাথার ভিতরের এলার্মটা সতর্ক ভাবে বেজে ওঠে। এপাশ ওপাশ করে আর লাভ নেই, নির্ঘুম চোখের ওপর জোর করে বন্ধ করে রাখার অত্যাচার আর না চালিয়ে উঠেই পড়ল অনামিকা।

উঠোনের মাঝে বাঁধানো বকুল তলাটার নীচে কেউ একজন গুটিসুটি মেরে বসে আছে। এই বাড়িরই সদস্য নিশ্চয়।

শিবু জ্যেঠু বোধহয়। বয়স্ক মানুষদের নিদ্রাবিহীন রাতগুলো বড় অত্যাচার করে। তাই ভোর না হতেই দম বন্ধ করা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মুক্ত হাওয়ায়, বোঝার চেষ্টা করে সত্যিই সকাল হয়েছে কিনা?

পাশের ঘর থেকে একটা মৃদু কান্নার রেশ কানে এল?

তবে কি আশা কাকিমা চলে গেলেন?

তিনদিন ধরে শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল কাকিমার। অনামিকাকে কাছে ডেকে বলেছিলেন, কি রে মেয়ে তোদের যাবার আগেই বোধহয় আমি এ বাড়ি

ছাড়বো। ভিতরটা কঁকিয়ে উঠেছিল অনামিকার, ওদের নতুন ফ্ল্যাটে যাওয়া আর কাকিমার চলে যাওয়ার মধ্যে যে বিস্তর ফারাক! বয়েস হয়েছে ঠিকই, তবে মৃত্যুর তো সঠিক বয়েস নেই, তাই মনে হয় আর দু' কি গ্রেস পিরিয়ড দেওয়া যেত না?

দরজাটা খুলে পাশের ঘরের দিকে যেতেই চোখে পড়ল, আশা কাকিমা একটা সাদা চাদরে শুয়ে আছেন, হয়তো প্রতিটি পল গুনছেন প্রাণ বেরোনোর অপেক্ষায়।

প্রতিবেশী হলেও একটা ঢেউ ওঠেই। অনামিকারও মনে পড়ল, দোপাটি গাছগুলোতে মাঝে মাঝে আশা কাকিমা জল দিয়ে দিতেন, ফুলের সময় সাদা দোপাটি তুলতেন কৃষ্ণ পুজোর জন্য।

আজ আবার সুদীপ্তর সাথে যেতে হবে নতুন ফ্ল্যাটে। প্রথমদিন তো ঝাঁ চকচকে নতুন ফ্ল্যাটে পা দিয়েই চমকে উঠেছিল অনামিকা। সুদীপ্ত ওকে না জানিয়ে এত বড় ফ্ল্যাট পছন্দ করেছে! ওকে তো শুধু বলেছিল একটা ফ্ল্যাট বুক করেছে, সেটা এত বড়! ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশনের লোকও হাজির, শুধু অনামিকার নির্দেশের অপেক্ষা। সুদীপ্ত এখন আইটি সেক্টরের যন্ত্রমানব। তার সব কিছু নিখুঁত চাই। অনামিকা পরদা, সিলিং, কর্নার ডেকোরেশন সমস্ত কিছুর একটা মোটামুটি স্কেচ করে দিয়েছিল, এবার তো ওদের হাতে। "টাকার জন্য চিন্তা করবেন না, শুধু মনের মতো করে সাজিয়ে তুলুন।" বলেছিল সুদীপ্ত।

স্যুটের কাপড় থেকে পায়ের স্যু পর্যন্ত এখন অহংকারে পরিপূর্ণ সুদীপ্ত। অবশ্য নিজের স্বামীর এই উন্নতি অনামিকার কাছেও যথেষ্ট গর্বের। তবে মাটির সাথে সম্পর্কবিহীন ওই ছ' তলার ফ্ল্যাটটা যেন হাওয়ায় ভাসমান। শিকড়হীন বাড়ি, যেখানে ধরে রাখার টান নেই। অনামিকার এই ভাবনা সুদীপ্তর বিরক্তির কারণ। আজ বোধহয় কোথায় কি ফার্নিচার থাকবে তার আলোচনা হবে। নিজের এত বড় ফ্ল্যাট হচ্ছে জেনেও কেন যে অনামিকার মনে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ নেই, সেটার কারণ হয়তো ওর নিজেরও অজানা।

সুদীপ্ত ব্রাশ করছে, অনামিকার দিকে তাকিয়ে বলল, একটু তাড়াতাড়ি

রেডি হয়ে নাও, প্রথমে ফার্নিচারের দোকানে যাবো তারপর ফ্ল্যাটে। দুপুরে বাইরে কোথাও একটা লাঞ্চ করে নিলেই চলবে।

অনামিকা আশা কাকিমার কথাটা বলতেই সুদীপ্ত বলল, ভদ্রমহিলা যে ভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন তাতে বেঁচে থাকাটাই শাস্তি।

কি সহজ হয় এদের উত্তরগুলো, জন্ম-মৃত্যুর রহস্যগুলোর সমাধানও যেন জলের মতোই সোজা। এদের স্মৃতিতে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে আশা কাকিমার হাতের কচুর শাকের স্বাদ ম্লান হয়ে যায় সহজেই।

শুধু অনামিকার স্মৃতির পাতাগুলোতেই ধুলো জমে না, বা লালচে হয়ে ভুলে যায় না।

মৃত্যুপথযাত্রীনিকে পিছনে ফেলে অনামিকা আর সুদীপ্ত এগিয়ে গেল ওদের নতুন আশ্রয়ের ঠিকানায়।

অন্যমনস্ক অনামিকা বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের জন্য, আরামদায়ক, সুবিধাজনক সমস্ত নামী দামি ফার্নিচার পছন্দ করল।

সুদীপ্ত ফ্ল্যাটের দরজার সামনে উত্তেজিত হয়ে বলল, অনু আমাদের নিজেদের গেটের সামনে থাকবে একটা নেমপ্লেট তাতে আমাদের দু'জনেরই নাম থাকবে।

ক্লান্ত হাসি হেসে সম্মতি জানাল অনামিকা। ভাগের কলতলা, বারোয়ারী উঠোন, সার্বজনীন ডাকবক্স — কোনটাই আর প্রয়োজন হবে না।

বাড়ি ফিরতে প্রায় ঘণ্টা তিনেক লেগে গেল। গলির মোড়ে ওরা ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল। এই ব্যানার্জী লেনের বাড়িটার গলিতে গাড়ি ঢোকে না বলে প্রায় প্রতিনিয়তই অসন্তুষ্ট হয় সুদীপ্ত।

বাড়িতে ঢুকেই নিজের নয়নতারার চারাগুলোতে জলসিঞ্চনের কাজে লেগে পড়ল অনামিকা। আহা রে! মাটিটা শুকিয়ে গেছে। সামান্য জলটুকুও যদি না পায় তাহলে ফুল দেবে কী করে।

নিজের মনেই ভাবতে লাগল ও। ফ্ল্যাটের কর্নারে বেশ কিছু ক্যাকটাস আর অর্কিড লাগাবেন বলেছিলেন ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশনের লোকেরা। নিশ্চয় তাদের জল লাগে না, তারা নিশ্চয় সুদীপ্তর মতোই পাথুরে। ফুলের

ভারে তারা গর্ভবতীর মতো নুয়েও পরবে না।

অনামিকার মন অভিমানে পরিপূর্ণ ...একটা কি উঠোনওয়ালা ছোট্ট বাড়ি কিনতে পারল না সুদীপ্ত। যেখানে বৃষ্টি পড়লে সোঁদা মাটির গন্ধ পাওয়া যাবে। ঐ আকাশচুম্বি ফ্ল্যাটের কি খুব দরকার ছিল।

বাড়ি থেকে পালিয়ে যখন সুদীপ্তকে বিয়েটা করেছিল, তখন সুদীপ্তর এক মামা এই ভাড়া বাড়িটা দেখে দিয়েছিল ওদের জন্য। সুদীপ্তর বাবা আগেই গত হয়েছিলেন। দুই দাদার সংসারে ওর মা থাকতেন। সেখানে অনামিকাকে দুই জা মোটেই মেনে নেয়নি। তখন থেকেই এই বারোয়ারীর কলতলায় ঠেলা ঠেলি করে জল নিয়ে অনামিকার ছোট্ট পুতুল পুতুল অনভিজ্ঞ সংসার চলতে শুরুর করেছিল। তখন সুদীপ্ত ছোট্ট একটা চাকরি করতো। তাই এর থেকে আর বেশি সামর্থ ছিল না ওর।

সুদীপ্তকে বিয়ে করে একটা অনিশ্চয়তার পথে পাড়ি জমাতে সেদিন ভয় করেনি অনামিকার। মনে হয়েছিল ওর ভীষণ চেনা মানুষটা তো আছে ওর সাথেই। অনামিকাকে সেদিন অনেক শুভাকাঙ্খী বন্ধু-বান্ধব বলেছিল, ভবিষ্যৎ না ভেবে এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ওর জীবনের চূড়ান্ত ভুল হতে চলেছে। অনামিকা বিশ্বাস করত, সুদীপ্ত পারবেই নিজেকে প্রমাণ করতে। সেদিন শুধু নিজের স্বচ্ছল জীবনের আকাঙ্খাটাই মূল্যবান ছিল না ওর কাছে, গুরুত্বপূর্ণ ছিল ওদের ভালোবাসাকে পরিণতি দেওয়া। অনেক যুদ্ধের শেষে রাত্রির ঘন অন্ধকার কেটে গিয়ে প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়মের মতোই আবছা হলেও আলো এসেছিল ওদের জীবনে। আর সেই আবছা আলোটুকু তখন বহন করে এনেছিল, এই ভাড়াবাড়ির এককুঠুরী ঘরটাই।

ওদের বিয়ে হয়েছে প্রায় তিন বছর। গতবছর অনামিকা নিজের গর্ভে নতুনের আগমন বার্তাও শুনেছিল কিন্তু সুদীপ্ত তখন বাবা হতে চায়নি। এই নিম্ন মধ্যবিত্তের ভাড়ার বাড়িতে নাকি তার সন্তান আসবে না। তাতে নাকি বাবা হিসাবে সুদীপ্তর অক্ষমতা প্রকাশ পাবে। তারও অবুঝ মন কাঁদছে, মাকে

চাক্ষুস না দেখতে পেয়ে। আবার ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে সে বিদায় নিয়েছিল ভ্রাণেতেই।

অনেক টাকা রোজগারের চেষ্টায় কবে যে সুদীপ্ত যন্ত্রমানবে পরিণত হয়ে গেল, অনামিকা বুঝতেও পারল না। হয়তো সুদীপ্ত শুধুমাত্র অনামিকাকেই সাচ্ছন্দ্য দেবার চেষ্টা চালায় প্রতিনিয়ত। অনামিকার আত্মীয়দের কাছে জামাই হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াইয়ে সুদীপ্ত নিমগ্ন, কিন্তু ওর তো পলেস্তরা খসা, দিনের বেলাতেও লাইট জ্বেলে রাখা ঘরটাকেই নিজের মনে হয়। এখানে নুন, চিনির কৌটোগুলো, সিঁড়ির নিচের রান্না ঘরটাকে ওর বড় আপন মনে হয়। নিজের হাতে বসানো দোপাটি, জবা গাছগুলোকে আত্মীয় মনে হয়। এদের ছেড়ে যেতে হবে ভেবেই মনের ভিতরটা গুমরে ওঠে অনামিকার।

জিনিসপত্র প্যাকিং শুরু হয়ে গেছে অনামিকার। পাশের ঘরে বৌদিরা যারা প্রায় আট-দশ বছর ওই ভাড়া বাড়িতেই কাটিয়ে দিলো জীবন, তারা অনামিকার ভাগ্যকে হয়তো ঈর্ষা করছে। কিন্তু বিয়ের পর এই ভাঙা উঠোনই যেন ওকে বৌ রূপে বরণ করেছিল, নাই বা ছিল আলতা চোবানো পা। তবুও বৌ হয়ে প্রথম পদচিহ্ন রেখেছিল এই উঠোনটায়। এই ছোট্ট রান্নাঘরই ওকে দিয়েছিল, ঘরণীর অধিকার। আজ এদেরকে কি এক নিমেষে ভুলে যেতে বসেছে অনামিকা! ভিতরের ঘুণপোকার দংশনের আওয়াজটা যন্ত্রণাদায়ক। কাউকে হয়তো বোঝানোও সম্ভব নয়, পুরনো বট গাছ কেটে দিলেও কেন তার শিকড়টা সেই মাটির অন্তরেই থেকে যায়।

ঐ আল্ট্রামর্ডান ফ্ল্যাট দেখে আসার পরও কেন এই গলির বাড়িটার জন্য অনামিকার মন হু হু করছে!

কাল থেকে ওই বল্টুর মা আর বলবে না, ''অনামিকা তোমার কাছে তেজপাতা আছে গো? দুটো দাও না আমাকে!'' অনামিকা কয়েত বেলের আচার মেখে ঐ উঠোনের এক কোণে শুকোতে দেবে না যেটা থেকে পাশের ঘরে রঞ্জু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে বলবে, ''কাকিমা একটু খেলাম, দারুণ মেখেছ। আমাদের স্কুলের সামনে এত ভালো মাখে না তো!''

হয়তো শিবানী বৌদি তিনটে বাড়ির পরের রায়েদের বাড়ির কর্তা গিন্নির ঝগড়া রসিয়ে বলতেও আসবে না আর অনুর কাছে।

কাজের মেয়ে শিউলি, মুখ ঝামটা দিয়ে বলবে না, এই এবড়োখেবড়ো উঠোনে বাসন মাজা যায় না বাপু, আর কোনোদিন ওই শ্যাওলা পড়া কলতলাতেও পড়ে হাত-পা ভাঙবে, কাল থেকে লোক দেখে নিও, আমি কাজ করতে পারবুনি।

শিবু জ্যেঠু আর বলবে না, খবরের কাগজের এই ছোট্ট ছোট্ট লেখা পাতাটা একটু পড়ে দেবে, এত ছোট লেখা নজর হয় না।

বৃষ্টির দিনে রাতুল কাগজের নৌকা বানিয়ে জল জমে যাওয়া উঠোনে ভাসানোর জন্য আর বায়নাও তো করবে না।

অনামিকার আজও মনে আছে, এই বাড়ির রেলিংবিহীন খোলা সিঁড়ি দিয়ে ও, শিবানী বৌদি আর বল্টুর মা তিনজনে চিলেকোঠার ঘরের জানলায় কান রেখেছিল, পাশের বাড়ির নতুন বর-বৌয়ের কথা শুনবে বলে। আর সেদিন প্রথম অনামিকা সয়াবিন আলুর ঝোল রান্না করতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলে মন খারাপ করে বসেছিল, সেদিন আশা কাকিমা ওদের ঘর থেকে কুমড়োর তরকারি দিয়ে গেছিল লুকিয়ে লুকিয়ে। সুদীপ্ত জানতেও পারেনি অনামিকা রান্না করতেই পারে না। এদের কাছ থেকেই অনভিজ্ঞ অনামিকা প্রতিদিন একটু একটু করে সংগ্রহ করেছে সব টুকিটাকি।

যখন সুদীপ্ত তিন দিনের জন্য টাটায় চলে গিয়েছিল ট্যুরে, তখন ভূতের ভয়ে নতুন বাড়িতে ঘুমুতেই ভয় করতো অনামিকার। শিবানী বৌদির একটাই শর্ত ছিল রাতে অনামিকার কাছে শুতে পারে, কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করতে হবে।

এই চৌকি টাইপের খাটটা যেটা সুদীপ্তর নতুন ফ্ল্যাটে বেমানান বলে বেচে দিচ্ছে সুদীপ্ত... সেটাতেই ওদের পালিয়ে বিয়ের ফুলশয্যা হয়েছিল। প্রথম সুদীপ্তর স্পর্শে অনামিকা মেয়ে থেকে স্ত্রী হয়ে উঠেছিল শুধু ঘরের রঙচটা সিলিংটা সব জানে। বাবা-মায়ের জন্য রোজ মনখারাপ

নোনতা জলে ভিজে যেতে যেতে এই বালিশটাই ওকে সান্তনা দিতো, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। এই পরম আত্মীয়দের ছেড়ে অনামিকা কি পারবে ঐ কংক্রীটের জঙ্গলে আবার নিজের সংসার গোছাতে! পারবে হয়তো! কারণ মেয়েরা তো জলের মতো।

বিয়ের পর এমন একটা ভাড়া বাড়িতে নিম্নমধ্যবিত্তের মতো থাকে বলে, প্রায় কোনো আত্মীয়ই ওর সাথে সহজ ভাবে সম্পর্ক রাখেনি, তা সত্ত্বেও কখনো একা মনে হয়নি ওর নিজেকে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যেতে দঁড়ির ক্যাম খাটে ওরা বসত মশলামুড়ি মেখে। কখনো অনু খালি গলায় গাইতো, রুমকি নাচতে শুরু করত হাত পা ঘুরিয়ে। হাজার অভাব অভিযোগের মধ্যেও কোথায় একটা আত্মার টান ছিল,. সম্পূর্ণ অপরিচিত অন্য জায়গা থেকে আসা মানুষগুলোর মধ্যে। সুদীপ্ত এগুলোর কিছুই জানে না, বরঞ্চ ওদের সাথে বেশি মিশলে ও বিরক্ত হতো।

ভোরবেলা উঠে টাইমকলে প্রথম বালতি রাখতে পারার উত্তেজনাটাই ছিল আলাদা, ভুটান বাম্পার লটারিতে প্রাইজ জেতার মতো।

তারপর বাড়িওয়ালার গাছে ঝড়ের দিনে লুকিয়ে আম কুড়োনো তো ছিলই।

এসব ভাবতে ভাবতেই সন্ধ্যা নেমেছে। আজ আর ভাড়াবাড়ির তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বলেনি। আশা কাকিমা চলে গেছেন বলে অপেক্ষায় রয়েছে এ বাড়ির সমস্ত অনাত্মীয়েরা।

এই অনাত্মীয়েরাই একদিন অনামিকাকে একাকীত্বের জ্বালা অনুভব করতে দেয়নি।

হয়তো এই অনামিকাই ওই ফ্ল্যাটের গৃহপ্রবেশে সকলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজের ঐশ্বর্য্য দেখাতে ব্যস্ত থাকবে। তখন নিশ্চয় মনেই থাকবে না বিপদের দিনে আশ্রয় দেওয়া এই ভাড়ার বাড়িটাকে। কারণ সে তো নিজের নয়, সে সমস্তটুকু দিয়ে আপন করে নিলেও কখনো অধিকার ফলাতে পারে না ...বলতে পারে না "এখানেই থেকে যাও, আমাকে ফাঁকা করে যেও না।" সময়ের নিয়মে সেও তখন আবার নতুন গলার স্বর শোনার জন্য প্রস্তুত হবে।
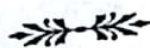
সময় থমকে গেছে

এই অর্চি, দেখ না বেনারসীর রংটা কি রকম হবে? পিক গ্রীন ওরা কিনেছে আমি রেডিস কিছু নিই কি বল?

অন্যমনস্ক স্বরে একটা পেঁয়াজখোসা রঙের জারদৌসির ওপর হাত রেখে বলল, আজ তো মল্লারকে সঙ্গে আনতে পারতিস।

কথা শেষ হবার আগেই অদ্ভুত চোখে তাকালো রুমি।

মল্লার! ও আমার সাথে বিয়ের শপিংয়ে এসে কী করবে?

একটু উষ্ণ স্বরে অর্চি বলল, কেন, বিয়েটা তো তুই ওকেই করছিস।

রুমি একটা শাড়ি গায়ের উপর ফেলে বলল, সে তো বাবার বন্ধু শ্যামল কাকুর ছেলে, বাড়ির সকলের পছন্দ বলে!

আর তোর? আলতো করে কথাটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল অর্চি।

রুমির দুই ভ্রুর মাঝে একটা বিরক্তির ভাঁজ খেলেই মিলিয়ে গেল যেন।

অর্চির হাতের পেঁয়াজ খোসা রঙের বেনারসীটা টেনে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে রুমি বলল, একমাত্র তুই আমার পছন্দ বুঝিস, হয়তো আমার থেকেও কিছুটা বেশিই।

রুমির এই উচ্ছ্বাসটা আগেও দেখেছে অর্চি, সেই ক্লাস থ্রি থেকে দেখে আসছে। যখনই মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে বেরোনোর পথ খুঁজে পায় না তখনই ওর মুখটা আনন্দে ভরে ওঠে।

রুমি ছোট্ট থেকেই খুব আদুরী। একটুতেই ঠোঁট ফোলানো বোধহয় ওর অভ্যাস ছিল। তখন ওদের দু'জনেরই ক্লাস থ্রি। টিফিন টাইমে অর্চি দেখল,

একটা গোলাপী গালের মেয়ের দু'চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গাল বেয়ে পড়ছে। মেয়েটা মোছার চেষ্টাও করছে না।

কাউকে কিছু বলছেও না। শুধু চুপটি করে এক কোণে বসে কেঁদে চলেছে। অর্চি তখন বন্ধুদের সাথে গোল্লা ছুটে মেতেছিল।

সেকশন বি এর দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ও।

মেয়েটার কাছে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ঠিক কী হয়েছে!

হাতের বুড়ো আঙুল থেকে রক্ত পড়ছে।

অর্চি ছুটে স্কুলের বাগান থেকে অনেকটা গাঁদা পাতা এনে চটকে রসটা ওর আঙুলে লাগিয়ে দিয়েছিল। মিনিট খানেক পরেই রক্ত বন্ধ দেখে মেয়েটি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল... তুই ম্যাজিশিয়ান? পিসি সরকারের মতো ম্যাজিক জানিস?

ওর পিঠে আলতো করে ঠেলা দিয়ে রুমি বলল, তাহলে এই শাড়িটা নিলাম বুঝলি। অর্চি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

চল চল, রুমি এবার তাড়া লাগাল, এখনো কসমেটিক্স কেনা বাকি। অর্চি বলল, লিপস্টিকটা কিন্তু ঐ বিশেষ ব্র্যান্ড ছাড়া নিস না। মনে আছে তো তোর অ্যালার্জি বেরোয় কিন্তু অন্য কিছুতে।

আমার সব কিছু তোর কী করে এত নিখুঁত মনে থাকে রে অর্চি?

মন থেকে ভালোবাসলে বোধহয় সবটুকু মনে রাখা যায় রে রুমি!

না, কথাটা যাতে কোনওভাবেই রুমির কানে না পৌঁছায় তাই ও জোর করে কণ্ঠনালীর মধ্যে চেপে রাখল কথাটাকে।

রুমির বাড়িতে অর্চির অবারিত দ্বার। রুমির বেস্ট ফ্রেন্ডের তকমাটা অনেক বছর আগেই বেশ শক্ত করে এঁটে গেছে অর্চির কপালে। রুমিও কথায় কথায় বলে, "ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড অর্চি। বড্ড বিশ্বাস করি তোকে।"

বন্ধুত্ব শব্দটা অনেকটা ছোট হলেও বেশ ভার বহন করতে হয়। তাই রুমির প্রতি অর্চির বন্ধুত্ব ভিন্ন অনুভূতিরা গোপন প্রকোষ্ঠে গুমরে মরেছে এতকাল।

এই অর্চি জানিস, আমি তো মল্লারকে ঠিক বুঝতেই পারছি না রে। আর ও অনুপমের গান ভালোবাসে না। স্মরঞ্জিতের গল্প পড়েনি। আরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খায়নি কোনোদিন! তুই জাস্ট ভাবতে পারছিস, এই এলিয়ানকে নিয়ে আমি কী করে সংসার করবো। তারপর আরো শোন, মাল্লার পার্কস্ট্রিটে নামি রেস্তোরা ছাড়া কোনোদিন ডিনার করেনি। তার মানে আমাদের ঐ বেশি করে পেঁয়াজ দিয়ে টক জল দেওয়া অবনীদার ঘুগনীর টেস্টই জানে না রে।

অর্চি ক্লান্ত হাসি হেসে বলল, এরপর থেকে তুইও এসবের স্বাদ ভুলে যাবি রুমি।

ধুর তুই কী যে বলিস!

রুমি হেসে উড়িয়ে দিল অর্চির অবান্তর কথা।

শুধু একটাই খটকা রয়ে যাচ্ছে ওর মনে, কেন যতই বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে ততই মনে হচ্ছে ওর চারদিকটা একটা অপরিচিত কুয়াশাচ্ছন্ন চাদরে ঢেকে যাচ্ছে।

সেই ঘন কুয়াশার ওপারে একটা অপরিচিত মুখ, যে মুখটার আদলটা অনেকটা মল্লারের মতো। মুখের প্রত্যেকটি রেখাকে চেনার শত চেষ্টা করেও বিফল হচ্ছে রুমি। রুমি বুঝতে পারছে, মল্লারের মনের গভীরে ডুব দিয়ে আসল মানুষটাকে খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। ওর বাইরের আবরণটা এতটাই দৃঢ় যে অন্তরের প্রবেশদ্বার নেই বললেই চলে।

অন্যমনস্ক রুমিকে ডেকে অর্চি বলল, এই পাগলী ঐ দেখ তোর প্রিয় চিকেন মোমো... চল খাবি তো? আজ আমি তোকে পেট ভরে মোমো খাওয়াবো। রুমি আবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে আছে অর্চির দিকে। মোমোর স্টলটা রুমি অনেক আগেই খেয়াল করেছে, খেতে ইচ্ছে করেছে, শুধু নিজের ইচ্ছেটাকে প্রকাশ করতে মন চাইছিল না। হয়তো অপেক্ষা করছিল, আদৌ অর্চির মনে আছে কিনা সেটাই পরীক্ষা করছিল রুমি।

না, এক্ষেত্রেও রুমি হেরেই গেল। অর্চি ঠিক মনে রেখেছে চিকেন মোমো ওর ফেভারিট। ভীষণ ভালোলাগাগুলো কখনো কখনো কষ্ট দেয়। এই মুহূর্তে

রুমির মনে একটা কষ্ট কষ্ট সুখের উদ্ভব হচ্ছিল। যে অর্চি ওকে এতটা চেনে, একটা বেঞ্চে তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবেই কষ্ট হচ্ছে, আর আরেকদিকে ও ভাবছে, এমন কেউ পৃথিবীতে আছে যে রুমিকে সম্পূর্ণ ভাবে চেনে। হয়তো রুমির নিজের থেকেও বেশি।

সেই জন্যই তো অর্চি ওর বেস্ট ফ্রেন্ড সেই ক্লাস থ্রি থেকে।

রুমির ঠোঁটের কোণে হঠাৎ একটা আলগা হাসি খেলে গেল। ক্লাস কাইভেও ওরা একই স্কুলেই পড়েছে। কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ম্যানেজের বক্সের পর প্রথম হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছে রুমি। প্রথম থেকেই ওর চিন্তা ও আর অর্চি কি একই সেকশান পাবে। নাম ডাকার সময় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে রুমি, নিজের নাম শোনার জন্য নয়। অর্চির নামটা কখন বলবে। অর্চি ওর পাশে বসে বসে বকে চলেছে।

অস্থির রুমিকে দেখে অর্চি বলল, তুই কী জন্য এত টেনশন করছিস রে? রুমি বলেছিল, তোর নাম তো বলল না, এ সেকশানে বলল না রে। অর্চি হেসে বলল, পাগলি ফার্স্ট নামটাই তো আমার বলল। তুই এতো টেনশান করছিস তাই শুনতে পাসনি হয়তো।

আনন্দে পাগলের মতো লাফিয়ে উঠেছিল রুমি। একটাই মজা ও আর অর্চি টিফিন ভাগাভাগি করে খেতে পারবে, অর্চিটা ম্যাথে বড় ভালো, রুমির অঙ্কের হোমওয়ার্ক নিয়ে কোনো চিন্তা থাকবে না।

অর্চির মনে হয়েছিল, ভালোই হলো রুমি ওর সেকশানে পড়ল, না হলে যা ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে, কেউ কিছু বললেই কাঁদতে শুরু করবে, অর্চি থাকলে না হয় সামলে দেবে রুমিকে। ক্লাস ফাইভের ছেলের এই আত্মবিশ্বাস দেখে রুমি বলেছিল, তুই আজ থেকে আমার সুপার হিরো।

রুমির একটা প্রশংসা বাক্যে অর্চির রক্ত কণিকারা দাপাদাপি শুরু করে দিতো, আজও দেয়।

নিজেকে মনে হতো স্পাইডারম্যান। মাঝে মাঝে দুঃখ হতো, যখন রুমি ক্লাসের অন্য ছেলেদের সাথে হেসে হেসে কথা বলতো। কেন যে কষ্ট হতো

সেটা আজও বুঝতে পারল না অর্চি।

রুমি রাস্তার অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে হাত নাড়িয়ে ডেকে যাচ্ছে, কি রে
জগতে আছিস তুই! এদিকে আয়...

রাতুল পিছন থেকে এসে অর্চির পিঠে জোরে একটা থাপ্পর কষিয়ে ব
কী রে খোঁজ খবর নেই কেন? অনেক দিন বাদে দেখা হলো রাতুলের সা
রাতুল আর অর্চি একই মাঠে ক্রিকেট খেলতে যেত। একবার রাতুলকে
বলে আউট দিয়েছিল বলে ফাঁকায় পেয়ে আম্পেয়ারকে পিটিয়েছিল দুই
মিলে। সেসব বহু দিন আগের কথা। রাতুল বলল, কীরে রুমির সাথে তে
প্রেমটা কেমন চলছে?

অর্চি সামলে নিয়ে বলল, কি যাতা বলছিস? রুমি আর আমি ভালো বন্
রাতুল রেগে গিয়ে বলল, রামক্যালানের মতো কথা বলিস না তো, ভা
বন্ধু! তোরা কি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির লোক নাকি রে যে 'ভালো বন্ধু' কথাটা ব্যবহ
করতে ধরেছিস।

অন্তত আমার কাছে লুকোস না অর্চি। আমি জানি তুই ম্যাচের মাঝখা
সকলের গালাগাল খেয়েও বেরিয়ে এসেছিস রুমি সন্ধ্যের টিউশান থেকে এক
ফিরবে বলে... এটা শুধুই বন্ধুত্ব! নারে ভাই মানতে পারলাম না। অর্চি ক্লা
হেসে বলল, সামনেই রুমির বিয়ে। মল্লার, রুমির বাবার বন্ধুর ছেলের সাথে
রাতুলের মুখটা হাঁ হয়ে গেছে। বিস্ফারিত চোখে রাতুল বলল, আমাদে
রায়দিঘীর সবাই জানে তোরা মেড ফর ইচ আদার, এখন রুমি অন্য কাউকে
বিয়ে করছে আর তুই ওর সাথে শপিং-এ এসেছিস?

অর্চি ধীরে ধীরে বলল, বন্ধুত্ব কথাটা ছোট্ট হলেও এর ভারটা যে বড় বেশি
রে রাতুল, তাই আর ভালোবাসি কথাটা বলে উঠতে পারিনি।

রাতুল বলল, চল আমি রুমিকে বলছি, সব কথা বলছি অর্চি। অর্চি ঘা
নেড়ে বলল, না, কিছুতেই না।

রুমি জানে, তুই প্রথম বল মারতিস রুমির নাম করে। রুমিকে আনন্দ একবার

...সপ্পিবেবি বলেছিল বলে তুই আনন্দর গালে ঘুষি মেরেছিলিস। জানে এসব রুমি?

অর্চি প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য বলল, তুই এখন কী করছিস? জব করবি, নাকি তোর বাবার ঐ বিশাল ফার্নিচারের দোকানে বসবি? কাকু, কাকিমা সব ভালো তো?

রুমি কখন ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা খেয়াল করেনি।

রুমি রাতুলকে চেনে। কুশল বিনিময় করতে দেরি হলো না। অর্চির মনে অজানা আতঙ্ক, রুমি কিছু শুনে ফেলেনি তো! ওর এতদিনের 'লুকিয়ে রাখা গোপন কথাটা ফাঁস হয়ে যায়নি তো রুমির কাছে?

রুমির মুখের শিরা উপশিরায় স্বাভাবিকত্ব দেখে তবেই অর্চি নিশ্চিত হলো।

রাতুল চলে গেছে। রুমি আর অর্চি আনমনে হাঁটছে। অন্য সময় দু'জনের মধ্যে কম্পিটিসন চলে কে আগে কথা বলবে, যদিও রুমিই যেতে। রুমিকেই বলতে হয় ওর না বলা কথাগুলো। অর্চি কোনদিনই প্রথমে চান্স পায় না। তবে রুমির ওই অভিমানী গোলাপি ঠোঁট দুটো যখন নড়ে তখন অর্চি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রুমির দিকে। কতবার রুমির কাছে বকুনিও খেয়েছে, ওর বলা গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো শোনেনি বলে।

ওদের সব কথা আজ যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। দু'জনেই চুপচাপ হেঁটে চলেছে। মাঝে মাঝে দু'জনের কড়ি আঙুল ছুঁয়ে যাচ্ছে হাল্কা ভাবে।

ঐ বিশেষ আঙুল ছুঁইয়ে কতবার দু'জনে আড়ি করেছে, কথা বলেনি একদিন। সেই আঙুলই যেন মনের বার্তা বাহাক।

অসাবধানে এই ক্ষণিক ছোঁয়া কি পারবে রুমির কাছে অর্চির মনের কালবৈশাখির আভাস পৌঁছে দিতে?

নিস্তব্ধতা ভেঙে রুমি বলে উঠল, জানিস অর্চি, মল্লার না তোর মতো নয়। ইচ্ছে করছে না কিছু বলতে, শুধু শুনতে ইচ্ছে করছে অর্চির। রুমির মুখে নিজের কথা। রুমি বলে চলেছে, এই যেমন তুই রাস্তা পার হবার সময় আমার হাতটা ধরিস, বা বলিস সাবধানে, দু'দিক দেখে... মল্লার বড্ড বেখেয়ালি। আমি

ওর পাশে আছি তবুও ও ফোনে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোনো মিটিং-এর আলোচনায় ব্যস্ত।

অর্চি নিজের গলার কেঁপে যাওয়াটাকে অতি সাবধানে সংযত করে বলল, বিজি ম্যান, কাজ তো থাকবেই।

রুমি অন্যমনস্ক ভাবে ঘাড় নাড়ল। রুমি বলল, চল অর্চি আজ আর শপিং করতে ভালো লাগছে না, গঙ্গার ধারে বসি।

এভাবে নিজেকে লুকিয়ে নিয়ে রুমির সামনে অভিনয় করে চলাটা সত্যিই বড্ড কঠিন। মনের সবকটা দরজাকে প্রবল চেষ্টায় বন্ধ করে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে অর্চির কাছে।

রুমি মল্লারের বাড়ির সম্পর্কে কিছু বলে চলেছে, অর্চি অন্যমনস্কভাবে ওর সব কথাতেই সায় দিচ্ছে।

ভীষণ ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরল রুমি। নিজের বিছানায় শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে মল্লারকে কল করল।

মল্লারের জন্য যে অফ হোয়াইট কালারের পাঞ্জাবীটা কিনেছে সেটাই বলতে চাইল ওকে, মল্লার একটু ঝাঁঝালো গলায় বলল, আচ্ছা রুমি তুমি কি বাচ্চা। আমার ইম্পর্টেন্ট প্রজেক্ট বাদ দিয়ে এখন আমি বিয়ের শপিং-এর গল্প শুনবো?

মল্লার নিজেই কেটে দিল ফোনটা। এ প্রান্তে রুমি তখনও ফোনটা ধরেই আছে।

অন্যপ্রান্তে তখন একটা যান্ত্রিক আওয়াজ।

মনে পড়ে গেল রুমির বছর দুয়েক আগে মেজমাসির ছেলের পৈতেতে ওর বাবা আর মা মাসির বাড়ি গিয়েছিল, রুমির শরীরটা খারাপ ছিল বলে ওর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কথা ছিল বাবা-মা রাতেই ফিরে আসবে। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়ায় ওরা মাসির বাড়িতেই থাকতে বাধ্য হয়েছিল। রাত তখন প্রায় বারোটা। রুমি কোনোদিন একা বাড়িতে থাকেনি। অনেকক্ষণ টিভি দেখে বই পড়ে বেশ কাটছিল। কিন্তু মধ্য রাতে ভয়টা শুরু হয়েছিল। কেমন একটা গা ছমছমে ব্যাপার। ঘরেতে টিউব লাইট জ্বালিয়েও ভয়টা কিছুতেই কাটছিল

না। ওর এ পর্যন্ত দেখা সমস্ত ভূতের মুভি মনে পড়ে যাচ্ছিল এক এক করে। এমন কি ঠাকুমার কাছে ছোটবেলায় শোনা ভূতের গল্পগুলোও যেন সব চোখের সামনে ভাসছিল। নিজের ছায়াটাকেই ভয় করতে শুরু করেছিল।

সেদিন রুমি অর্চিকে ফোন করেছিল। হয়তো সবে ঘুমিয়েছিল অর্চি। অত রাতে রুমির ফোন পেয়ে চমকে উঠেছিল অর্চি। ভয় পেয়ে বলেছিল, কি হয়েছে তোর? এমন লাগছে কেন তোর গলাটা!

সেই একলা থাকার রাতেও অর্চি ওর সাথে ছিল। রুমি খুব ছোট থেকেই দেখেছে, ওর সব না বলা কথা অর্চি যেন কি অদ্ভুত উপায়ে বুঝে ফেলে। আজও ঠিক তেমনি একটা ভয়ের রাত রুমির কাছে। সেদিন রুমির ভূতে ভয় করছিল আর আজ নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়েছে রুমি। মন মুখের আয়না এই সূত্র ধরেই ফুটে উঠেছে রুমির দ্বিধাবিভক্ত মনের ছবি। একদিকে রয়েছে পারিবারিক সম্মান আর মল্লার, অন্যদিকে রুমিকে আপন করে বোঝার মানুষটাকে হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণা। একটা শিরশিরে অনুভূতি ওর শিরদাঁড়া দিয়ে নেমে যেতে যেতে বোধহয় বলে গেল, এখনো ভাবো!

দু'চোখে নোনতা জলের ধারাটাকে না মুছেই ফোন করল অর্চিকে। খুব সোজাসুজি একটা কথা আজ জানতে চাইবে রুমি।

অর্চির মতামতটা খুব জরুরি ওর জন্য।

অর্চি রিসিভ করতেই রুমি জিজ্ঞেস করল, এই অর্চি একটা কথা সৎ ভাবে বলবি?

অর্চি বলল, তেমন মিথ্যে তো বলিনি তোর কাছে। শুধু একদিন সিগারেট খেয়ে লুকিয়েছিলাম আর আরেকবার তোর হোমওয়ার্কের খাতা থেকে টুকেছিলাম তোকে না জানিয়ে। এর বাইরে আর মিথ্যে তো মনে পড়ছে না। শুধু অর্চির অন্তরাত্মা বলছে, সব থেকে বড় প্রবঞ্চনা তো করেছ নিজের সাথে। রুমিকে ভালোবাসে অর্চি, এই সত্যিটাও অবশ্য লুকিয়ে গেছে অর্চি।

রুমি সিরিয়াস গলায় বলল, আমার মজা করার মুড নেই। সিরিয়াসলি শুনে বল।

মল্লার কি আমার জন্য পারফেক্ট? নাকি আদৌ নয়?

নিজের হৃদপিন্ডের ধুক পুক আওয়াজটা অর্চির কানে এসে হাজির। ম
কি কোনোভাবে টের পেয়ে গেছে অর্চির না বলা কথা! আর কিছু কি অ
করছে অর্চির জন্য! এক এক সেকেন্ডের প্রহর বড় দীর্ঘ লাগছে অর্চির কা

রুমি বলল, কীরে তুই কি ভাবতে ভাবতে রাত কাটিয়ে দিবি? বলবি কি

মল্লারের মতো অমন যন্ত্রমানব কি আদৌ কোনোদিন আমাকে বুঝবে

ভাগ্যিস ফোনের অন্যপ্রান্ত থেকে অর্চির নেতিবাচক ঘাড় নাড়াটা রুমি দেখ
পাচ্ছে না। অর্চি ঘাড় নেড়ে না বললেও মুখে বলল, কিন্তু তোর বিয়েটা তো
আঙ্কেল ঠিক করেছিল, আর এতদিন তো তুই ও মত দিয়েছিস, আর মা
ক'দিন বাকি তোদের বিয়ের, এখন এসব কথা কেন ভাবছিস?

মল্লার যে রুমির কোনো অনুভূতিরই মূল্য দেবে না সেটা অর্চি বুঝেছি
রুমির গত বছরের জন্মদিনের দিন। মল্লারের তো আগ্রহই ছিল না রুমিকে
বোঝার বা জানার। রুমি যে অন্য মেয়েদের মতো লাল গোলাপ একেবারে
পছন্দ করে না সে টুকু পর্যন্ত মল্লার জানে না। একগুচ্ছ লাল গোলাপ হাতে
নিয়ে হাজির হয়েছিল সেদিন। গেটের কাছেই অর্চির সাথে দেখা, রুমির ফোনে
মল্লারের ছবি দেখে দেখে ওকে চিনতে কোনো অসুবিধাই হয়নি অর্চির। মল্লারের
হাতে লাল গোলাপের ব্রাঞ্চ দেখেই প্রমাদ গুনছিল অর্চি। গোলাপ হাতে রুমির
সামনে ঢুকলেই যে জন্মদিনের পুরো মেজাজটা নষ্ট হয়ে যাবে সেটা খুব ভাল
করে জানতো অর্চি। রুমির খুব প্রিয় বড় জেঠিমা নাকি রেগুলার একটা করে
লাল গোলাপ খোঁপায় আটকাতো, জেঠিমা অল্প বয়সে মারা যান। তারপর
থেকেই লাল গোলাপে রুমির আপত্তি। ওটা শুধু জেঠিমারই থাক, এই মত
নিয়েই চলছে ও। অর্চি মল্লারকে বোঝাতে চেয়েছিল কিন্তু একগুঁয়ে মল্লার
অর্চির কথা না শুনেই গোলাপ হাতে ঢুকেছিল জন্মদিনের পার্টিতে।

ফুলটা হাতে নেবার আগে রুমি বলেছিল, আমি লাল গোলাপ পছন্দ করি
না। গোলাপী টিউলিপের ব্রাঞ্চটা রুমির হাতে দিয়ে অর্চি বলেছিল, মল্লার এটা
এনেছিল। তোকে রাগানোর জন্যই হয়তো ওটা তোর হাতে দিয়েছিল। রু

ভ্রু কুঁচকে বলেছিল, অর্চি যে কারণে আমি লাল গোলাপ পছন্দ করি না সেটা মোটেই কোনো ফানি বিষয় নয়।

মল্লার চুপ করে বিরক্ত মুখে সরে গিয়েছিল। তারপর থেকে অর্চির সাথে সামনা-সামনি হলেও কথা বলতে চায়নি মল্লার।

রুমি ফোনে তাগাদা দিল, কি রে বললি না! মল্লার কি আদৌ পারফেক্ট আমার জন্য?

অর্চি ঢোক গিলে বলল, অনেক রাত হলো ঘুমিয়ে পর। কাল তো আবার তোর শপিং আছে। রুমি কিছুক্ষণ ধরে থেকে, ফোনটা কেটে দিল।

ঠিক কী বলতো অর্চি রুমিকে? মল্লার কেন কেউই রুমির সব না বলা কথা বুঝতে পারবে না একমাত্র ও ছাড়া। কী করে বলতো অর্চি, ভালো বন্ধুর আড়ালে অর্চি শুধু রুমিকেই ভালোবাসে আর হয়তো ভবিষ্যতেও বাসবে। রুমি অন্যের হয়ে গেলেও বাসবে।

এপ্লিকেশনটা অফিসে জমা দেওয়ার আজই লাস্ট ডেট। অর্চি চায় রুমির বিয়ের আগেই ট্রান্সফার নিয়ে ওদের হায়দ্রাবাদের ব্রাঞ্চে জয়েন করতে। কলকাতায় বসে রুমির বিয়ের সানাইয়ের সুর, রুমির গায়ের বেনারসীর লালিমা, ওর সিঁথির রক্তবর্ণ সিঁদুর আর রজনীগন্ধার সুবাস সহ্য করা অর্চির পক্ষে সত্যিই অসম্ভব।

মল্লারের সাথে আজ শপিংয়ে বেরোনোর কথা আছে রুমির। ওর হাতের আংটিটা কিনবে দু'জনে মিলে।

রুমি হালকা আকাশনীল শালোয়ারটা পরতেই মনে হলো, অর্চি পাশ থেকে বলল, এই কালারটা তোর জন্য পারফেক্ট। একটা এক্সপোতে গিয়ে একবার ও আর অর্চি পছন্দ করে কিনেছিল সালোয়ারটা।

রেডি হয়ে বেরোতে যাবে ঠিক সেই সময় মল্লার জানাল, সরি রুমি, আজ যাওয়া ইমপসেবেল, প্রোগ্রামটা আগামী কাল করো।

রুমি নিশ্চুপ।

ছোটবেলায় একবার মা বাবার সাথে রুমি সিকিম বেড়াতে গিয়েছিল। পাহাড়ের ধার ঘেঁষে গাড়িটা চলছিল। রুমি চোখ বন্ধ করে মায়ের ধরে ছিল। বারবার মনে হচ্ছিল খাদের একেবারে ধারে ও দাঁড়িয়ে একটু অন্যমনস্ক হলেই পা পিছলে নীচে পড়ে যাবে। একটা ভয় ভয় কেঁপে উঠছিল রুমি।

আজ আবার সেই ছোটবেলার পুরোনো অনুভূতিটা ফিরে এলো ঠিক সেই সময়েই একটুও অস্পষ্ট নয়, স্পষ্ট একটা মুখ রুমির খোলা সামনে ভেসে উঠল। এরপর সময় নষ্ট করলে বোধহয় চূড়ান্ত দেরি যাবে। কাঁধে ব্যাগটা নিয়ে ট্যাক্সি ধরে সোজা ছুটল নির্দিষ্ট ঠিকানায়। আর ওর সামনে কোনো আবছা পথ নির্দেশ নেই, খুব পরিষ্কারভাবে পথটা ও দেখতে পাচ্ছে।

অফিসের লিফটে যথেষ্ট ভিড়। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করার সময় রুমির হাতে নেই। ওর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। শুধু জানাতে হবে অফিসের সিড়ি বেয়ে রুমি ছুটছে। প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে ঢুকল

ওকে দেখেই অর্চি চমকে উঠেছে। এভাবে ফোন না করে সোজা অফিসে তো কখনো রুমি আসেনি। ওর তো মল্লারের সাথে বেরোনোর কথা। নিশ্চয় মল্লার আবার কোনো গন্ডগোল করেছে। মুখটাও লাল হয়ে রয়েছে। অর্চির ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে মল্লারের ঠাসিয়ে একটা থাপ্পড় দিতে। অকারণে রুমিকে এত কষ্ট কেন দিচ্ছে

একটা চেয়ারে বসেছে রুমি। অর্চি জলের বোতলটা এগিয়ে দিল। কথা না বলে জলটা খেয়ে বলল, তোর সাথে কথা আছে।

অর্চি বলল, অফিসের পরে বললে হয় না। রুমি ঘাড় নেড়ে জানাল হয় না।

অফিসের অনেকেই দেখছে দেখে রুমিকে নিয়ে নিজের কিউবের ঢুকে এল অর্চি। রুমির ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে। চোখ দুটোও চিক করছে যেন।

খুব আস্তে আস্তে রুমি বলল, ঠিক তেত্রিশ মিনিট আগেই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম আমি মল্লারকে চাই না। আমি অন্য কাউকে ভালোবাসি অর্চি। তুই হয়তো বুঝতে পারছিস আমি কাকে ভালোবাসি।

অর্চি হাত দিয়ে রুমির মুখটা চেপে ধরে বলল, একটু চুপ কর। অনেকদিন স্বপ্নে দেখেছি আমি তোকে প্রোপোজ করছি। ভোরের পাখিরা জাগিয়ে দিয়ে বলে গেছে ওটা নিছকই স্বপ্ন। আজ সেই বহুবার দেখা স্বপ্নের পুনারাবৃত্তি হোক বাস্তবের মাটিতে। হাঁটু গেড়ে সবুজ কার্পেটের ওপর বসে আছে অর্চি। হাতে আজ টিউলিপ নেই। নিজের পকেটের পেনটা নিয়ে সিনেমাটিক ঢঙে ও বলল, তুই আমার সবটুকু জানিস। তুই তো ক্লাস থ্রি থেকেই জানিস আমি ম্যাজিক জানি। তাই আজ তোর সব দুঃখটুকু নিয়ে নেবো, আর তোকে দেবে সবটুকু সুখ।

রুমি বলল, এবার চল আমার বাবাকে প্রোপোজ করবি। অর্চির পকেটে তখন ট্রান্সফারের এপ্লিকেশনটা মুচকি মুচকি হাসছে।

দেখা না দেখায় মেশা

ইজি চেয়ারে বসে আছেন মৃন্ময়। ডুব সূর্যের আলোয় আরেকটা অলস বিকেল দেখছেন চোখের সামনে। নিজের তৈরি বাগানের সবজে হলদে পাতাগুলো তাদের ইহ জীবনের কাজ সাঙ্গ করে মাটির সাথে বন্ধুত্ব করতে বদ্ধপরিকর। গাছের কচি সবুজের চিন্তারও অতীত যে তারাও একদিন বেরঙিন হবে, ফুর ফুরে হাওয়ায় দোল খেতে খেতে কবে যে বোঁটা আলগা হয়ে সম্পর্ক ছিন্ন হবে জন্মদাতার সাথে, তার অঙ্ক তাদেরও অজানা।

বছর সাতান্নর সুঠাম দেহের অধিকারী মৃন্ময়ও জানতেন না কবে থেকে তার সাঁতরে নদী পার করতে ভয় করবে। গোলাপের সদ্য বসানো চারাগুলোয় কি রঙের বাহার আসবে না জেনেই নার্সারির সুজয়ের মুখের ভরসাতেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, ঐ ডানদিকের কোণের গাছটায় নীল গোলাপ ফুটবে।

মৃন্ময়ের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে মানুষজন খুব কমই যাতায়াত করে, এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাই নয়। মানুষের হাতে সময় কম থাকলে তবেই তারা শর্টকাট করার জন্য এই দেবদারু ঘেরা রাস্তাটা ধরে।

সামনেই এস ডিও সাহেবের বাংলো, তার ঠিক পাশেই একটা পলেস্তরা খসা একতলা। উঁচু পাঁচিলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পথ চলতি মানুষের কৌতূহল সৃষ্টি করে ওই বাংলোর না দেখতে পাওয়া অংশ।

অদেখার প্রতি আগ্রহ তো জন্মগত, অপরিচিতির আড়ালেই যত রহস্য জমাট বাঁধে, পরিচয়ের আলোয় তা প্রকট হলেই নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের

মতোই তা হয়ে ওঠে অতি সাধারণ।

এই পথে যাওয়া মানুষগুলোর কাছে তাই মৃন্ময়ের তৈরি গোলাপের বাগানটা আকর্ষণীয় হলেও, আড়ালে নয়। বিশাল গ্রিলওলা গেট দিয়ে বাগানের প্রতিটা কুড়ির পাঁপড়ি খোলাও সকলে দেখতে পায়। সে তুলনায় গেটের সামনে পোশাকধারী সিকিউরিটির লাল চোখের চাহনি এড়িয়ে ঐ বাংলোর ভিতরটা মানুষকে টানে বেশি।

"কী ব্যাপার মৃন্ময়দা কফি পর্ব মিটল?"

গেটের বাইরে থেকে পলাশ জানতে চাইল। পাশাপাশি অনেকেই জানে মৃন্ময় চা প্রিয় নয়, বিশেষ করে যখন ইজি চেয়ারে বসে নিজের অবসর সময়ের ছবি আঁকছেন নিপুণ হাতে, তখন তো নয়ই। এই সময় তিনি শুধু এক কাপ তেজী কফিই পান করবেন। যার তিতকুটে স্বাদে গলা পর্যন্ত তেতো হয়ে যাবে, কারণ তার এই স্পেশাল কফিটা চিনির মিষ্টতা বর্জিত।

মৃন্ময় রায়চৌধুরী একজন নামী লেখক। যদিও তার লেখা সাধারণ পাঠক মহলে খুব কমই আলোচিত হয়। কারণ তিনি গল্প উপন্যাস কম, প্রবন্ধ লেখেন বেশি। সাহিত্য মহলে একটি বিতর্কিত নাম, আর এই বিতর্কের কারণ তার লেখনী। তার বেশিরভাগ লেখাতেই একটা প্রতিবাদী মন দেখা যায়, তা সে ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে হোক আর কুসংস্কারমুক্ত মনের ভণ্ডামির বিপক্ষেই হোক।

"হরিপদ দেখিস, গোলাপ কুঁড়িগুলোতে যেন পোকা না লাগে।" খাস লোক হরিপদ এ বাড়িতে আছে প্রায় সাতাশ বছর। মৃন্ময়ের একমাত্র বিশ্বাসের জায়গা হরিপদ। সাহিত্য সম্মেলনে যাবার আগে ধুতি পাঞ্জাবি ঠিক করে দেওয়া থেকে কলেজের নিত্য দিনের পোশাক গুছিয়ে রাখা সবই ওর দায়িত্বে।

"বুঝলি হরিপদ, আর মাত্র তিনটে বছর কোনো মতে ঘঁষে ঘঁষে চালিয়ে দিতে পারলেই কলেজ থেকে রিটায়ার করব, তখন এই বাগান আর ঐ কাগজ কলম।" কথাটা যে ঠিক হরিপদকে শোনানোর জন্য বলা তা নয়,

হয়তো মৃন্ময়ের স্বগতোক্তিটা হরিপদর কানে ভেসে গেল।

বাংলার প্রফেসর মৃন্ময় রায়চৌধুরী যখন ক্লাসে বক্তৃতা দেবার ঢঙে মধ্যযুগের অন্ধকারময় সময়ের বর্ণনা দেন, তখন ছাত্রছাত্রীরা নিমেষে পৌঁছে যায় সেই মধ্যযুগের দম বন্ধ করা পরিবেশে। যেখানে গিয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য নির্বাক হয়ে গিয়েছিল, সাহিত্য-শিল্প।

"বাপি আমি হায়দ্রাবাদের চার্মিনারের ঠিক সামনে থেকে তোমাকে কল করছি। দু-চার দিনের মধ্যেই কলকাতা যাবো। এবারে নিশ্চয়ই তোমার সাথে দেখা হবে। আমরা না হয় জমিয়ে একদিন উইদাউট সুগার কফি খাবো।" মুঠোফোনে শতভিষার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন মৃন্ময়।

শতভিষা রায়চৌধুরী, যার গবেষণার বিষয় স্ট্রিট বেগার্স। মৃন্ময়ের একমাত্র মেয়ে। স্বভাবটা কিছুটা মৃন্ময়ের মতোই হয়েছে। খামখেয়ালি, একটু অহংকারী। নিজের সিদ্ধান্তে স্থির। এক্ষেত্রে অনেকেরই মনে হতে পারে, শতভিষার গবেষণার বিষয় কি করে ফুটপাতের মানুষ হয়? সেক্ষেত্রে একটা কথা বলতেই হয়, শতভিষাকে যারা অহংকারী বলেন তারা সবাই ওদের ক্লাসের। কিন্তু রাস্তার ধারে রুক্ষ চুলের ছোট ছোটো ছেলে-মেয়েগুলো, যাদের প্রধান জীবিকা ভিক্ষা, যারা দিনরাত পথচলতি মানুষদের বিরক্তির কারণ, তাদের মতে তিন্নি দিদি মা দুর্গা। তিন্নি শতভিষার ডাক নাম।

তিন্নি নাকি দশ হাতে ওদের জন্য ভিক্ষা করে এনে দেয় ওদের প্রিয় কেক, চকলেট।

(২)

অবশেষে কলটা করেই ফেলল সৌম্য। ওপ্রান্তের যান্ত্রিক আওয়াজটা এক নাগাড়ে হয়ে চলেছে। না, কোনো রোমান্টিক গানের কলি নয়, ঐ ধাতব রিংটোনটাই কানে বাজছে সৌম্যর। হৃদপিণ্ডের দ্রুতগামী হবার চিহ্ন স্বরূপ নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছে ও।

নির্দিষ্ট নাম্বারটা ডায়াল করার সময় পুরুষাঙ্গের উত্থানটা এই মাত্র খেয়াল করল সৌম্য। শুধু ওর মন নয় শরীরও চায় ভীষণ ভাবে তৃপ্তি পেতে। ছাব্বিশ বছরের একটা ছেলের শারীরিক ক্ষুধাটাকে অকারণে অস্বীকার করতেই বা যাবে কেন? নিজের কাছে যুক্তির পাহাড় সাজালো সৌম্য।

ওপ্রান্তে নারীকণ্ঠ কোনোরকম উত্তেজনা ছাড়া অভ্যস্ত ভঙ্গিমাতে বলে চলেছে...‘‘আপনাকে স্বাগত জানাই এই ‘সম্পর্ক’ ফ্রেন্ড ক্লাবে। প্রথমে নিজের নাম আমাদের সদস্য পদে নথিভুক্ত করুন। নাম নথিভুক্ত করাতে মাত্র এক হাজার সাত টাকা আমাদের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করুন, আমাদের অ্যাকাউন্ট নাম ও নাম্বার হলো, রজত চৌধুরী, ৫৬...। আপনি এই অ্যাকাউন্টে টাকাটা ডিপোজিট করে দিন।’’

বেশ সেক্সি গলা মেয়েটার। উত্তেজিত সৌম্য জিজ্ঞেস করল, ‘‘আর আপনার নাম? আমি কি একটু সেপারেট ভাবে আপনার সাথে কথা বলতে পারি?’’ বিকৃতকাম মানুষদের সাথে বাক্যালাপ করতে করতে মোহিনী গত পাঁচ মাসে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, এই পুরুষ মানুষগুলোর কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ছাড়া ওর আর কিছুই উৎপন্ন হয় না। মোহিনী খুব ভালো করেই জানে, ভালোবাসার বা বিয়ের প্রতিশ্রুতি পাবার জন্য কেউ ওর সাথে কথা বলতে চায় না। শুধুমাত্র ফোনে কথা বলে, গলার স্বরে ইজ্যাকিউলেশন ঘটাতে চায় কিছু পুরুষ। একই নিরুত্তাপ গলায় মোহিনী বলল, ‘‘কাল ঠিক সকাল এগারোটার পর আপনি আমাদের এই অ্যাকাউন্টে এডভান্স টাকা জমা করুন। তারপর কল করবেন।’’ ফোনটা কেটে দিল মোহিনী।

সৌম্যর একটা মহিলা কণ্ঠ প্রয়োজন ছিল এই সময়। ওর এই হস্ত মৈথুনের সময়ের গ্লানীগুলো নিমেষে কেটে যেত যদি একটা নারীকণ্ঠের অস্ফুট আওয়াজ ও কানে শুনতে পেত।

‘‘কী রে? ভর সন্ধ্যেবেলা দরজা বন্ধ করে কী করছিস?’’ দরজার বাইরে মা, হাত দিয়ে দরজায় হালকা ধাক্কা দিয়ে ঠুক ঠুক করে চলেছে। সৌম্যকে

বন্ধ দরজা খোলার নির্দেশ। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের অর্থের সাথে সাথে নিজস্ব সময়েরও বড়ই অভাব। প্রাইভেসি শব্দটা এই পরিবারগুলোতে কোনোদিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

ছাব্বিশ বছরের অবিবাহিত ছেলে কোনো ভাবেই নিজের ঘরের দরজায় ছিটকানি লাগাতে পারে না, একমাত্র আত্মহত্যার মানসিকতা ছাড়া।

এটাচ বাথ নেই বলে এমনিতেই সৌম্যকে ওর চটচটে আধপুরোনো অন্তর্বাস পরিবর্তন করতে উঠোনের পাশের কলতলাতে যেতেই হতো কিন্তু এই ঘন বীর্যপাতের পর ক্লান্ত অর্ধতৃপ্ত শরীরটা আরেকটু আগলে রাখতে চাইছিল বিছানাটাকে। এই সুখানুভূতিটুকুকে জলাঞ্জলী দিয়ে এক ঝটকায় উঠে পড়ল সৌম্য। দরজা খুলতেই এক ঝাঁক প্রশ্নের সম্মুখীন হলো ও। অস্বাভাবিক নয়, প্রশ্নগুলো ওর অতি পরিচিত। ওর কাঁধের আড়াল দিয়ে মা ঘরের সিলিং ফ্যানের অবস্থান বা অন্য কিছু দেখার চেষ্টা করছে। মাকে সুযোগটুকু করে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সৌম্য। ঠান্ডা জলও কখনো কখনো শুধু শীতলই করে না তৃপ্তিও দেয়। বাথরুমে টিনের দরজাটাকে পটপট আওয়াজ করে বন্ধ করতে শ্যাওলা ধরা বাথরুমটা ওকে কিছুটা গোপনীয়তা দিলো। লোহার বালতিতে ধরে রাখা জল শিথিল হয়ে যাওয়া যৌনাঙ্গে ঢালতেই ফ্রেন্ড ক্লাবের মেয়েটির গলাটা কানের মধ্যে ভেসে এল।

কল্পনার ডানাগুলো অধিক সময়েই বেশ প্রশস্ত হয়। সেই ঠাকুরমার ঝুলির সময় পক্ষীরাজের পাখনার মতো কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা। শীতল জলের ধারায় সিক্ত হতে হতে সৌম্য কল্পনা করতে শুরু করল, ফোনের অন্য প্রান্তের মেয়েটির উদ্ধত স্তনযুগলের ঈষৎ কালচে বৃন্তদুটোকে। নিজের সামনের দুপাটি দাঁত তীব্র টক খাওয়ার মতোই শিরশির করে উঠল।

গত কালই দু'জন স্টুডেন্ট মাইনে দিয়েছে, প্যান্টের পকেটে ষোলোশো টাকা রয়েছে সৌম্যর। একটা নতুন পাঁচশো। না কালো না সবুজের মিশ্রণে অদ্ভুত একটা রং, গন্ধটা কিন্তু আভিজাত্যের।

...ফোনে কথা বলা মেয়েটিই কি সৌম্যর শয্যাসঙ্গিনী হবে? নাকি অন্য কেউ...
...ভাবনার পারদ কল্পনার ছোঁয়ায় বাড়তে বাড়তে ক্রমশ অবশ হয়ে যাচ্ছে
...র বিকল মন।

আর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তারপরই সৌম্য একেবারে নিজের করে
পেয়ে যাবে একটা সম্পূর্ণ নারী শরীর। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য সে শুধু
সৌম্যর।

এক হাজার সাত টাকার বিনিময়ে ও কিনে নিতে পারবে ঐ মহিলার
কিছু মুহূর্ত।

(৩)

ঝুপ করেই সন্ধ্যা নামল মৃন্ময়ের বাগানে। অবশ্য আলোকে ধীরে ধীরে
গ্রাস করে অন্ধকারের হাতছানিতে সাড়া দেবার মুহূর্তেরা খুব আপন মৃন্ময়ের।
এই সময় কলম সচল হতে চায়। নেহাত কবিতা লেখায় ওর মন বিদ্রোহ
করে, তাই আর হয়ে ওঠে না।

কলকাতায় এই নাতিশিতোষ্ণ আবহাওয়া তো বিরল। কংক্রিটের উত্তাপ
এখানে দ্রুততার সাথে গ্রীষ্মকে ডেকে আনে। তাই এই হঠাৎ পাওয়া ফাল্গুনী
নরম উষ্ণ হাওয়ায় মৃন্ময়ের ঠিক শীত করেছে না, তবে একটা হাল্কা চাদর
হলে আরামপ্রিয় মানুষদের ভালো হয় আর কি।

একমাত্র মৃন্ময়ের মনের না বলা কথা পড়তে পারে হরিপদ, তাই রোজকার
ব্যবহার করা সুতির চাদরটা ওর হাতে ধরিয়ে দিল।

নিজের স্টাডিতে ঢুকলেই আজকাল মৃন্ময়ের লিখতে কম, পড়তে বেশি
ইচ্ছে করছে।

আজকালকার দিনের অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা বেশ বিতর্কপ্রবণ। নিজের
মতামতকে পাঠকের কাছে পৌঁছানোর জন্য তারা উপযুক্ত তথ্য দিচ্ছে। হয়তো
সব তথ্য সঠিক নয় কিন্তু এই সাহসী মানসিকতাটাকেই কুর্নিশ জানায় মৃন্ময়।

নিজের প্রিয় কলম আর লেখার ডায়েরিটা নিয়ে বসতেই, একটা মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। ওর একাগ্রতা নষ্ট করার একটা আপ্রাণ চেষ্টা থাকে ঐ বিশেষ অবয়বের। বেশ কিছুক্ষণ মৃন্ময়ের সৃষ্টি পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ওর চিন্তাশক্তিকে দুর্বল করে তবেই তার আনন্দ। যতক্ষণ না মৃন্ময়ের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের সঞ্চার হচ্ছে আর তার ঠোঁটের কোণে তৃপ্তির হাসি ফুটছে, ততক্ষণ সে আগলে রাখে মৃন্ময়ের একাগ্রতা। বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি যুদ্ধের পর অর্ধেক জয়ী মৃন্ময় কলমে আঁচড় টানে নতুন পাতায়। এইভাবে মনের সাথে যুদ্ধ করেই লিখে চলেছে বিগত ষোলো বছর। তারপর যখন সাহিত্য মহলের সমালোচকরা আড়ালে আবডালে মৃন্ময় রায়চৌধুরীর ব্যাক্তিগত জীবনের ঢেকে রাখা অংশে আলোকপাত করতে চায় তখনই সংকুচিত হয়ে যায় মৃন্ময়।

(৪)

না, সুজয়, রবিন, বিকাশের মতো প্রেম করতে পারেনি সৌম্য। আবার অমিতের মতো প্রেমে ব্যর্থ হয়ে কবিতা লিখতেও পারেনি। প্রেমিকা যেহেতু নেই, তাই তার চোখের আড়ালে কোনো কর্লগার্লকে এক রাতের জন্য শয্যাসঙ্গিনীও করে উঠতে পারেনি সৌম্য অন্য বন্ধুদের মতো। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের নীল ছবির পর্দার নিরাভরণ নারীই ওকে দিয়েছে একটা পূর্ণ মেয়েলী শরীরের বিবরণ। অন্যের সাথে রতিক্রিয়ায় বিভোর নায়িকার যোনিদ্বারে নিজের পুরুষাঙ্গ প্রবেশের কাল্পনিক সুখ পেতে পেতে সৌম্য এখন ক্লান্ত, বিদ্ধস্ত।

মাথার ওপরে জলজ্যান্ত এক বোন আর দিদি যেখানে অবিবাহিত হয়ে সমাজ সংসারে লাঞ্ছিত হচ্ছে, সেখানে ছাব্বিশ বছরের বেকার যুবকের বিয়ের কথা ভাবাটা নিম্ন মধ্যবিত্ত কেন উচ্চবিত্ত সংসারেও নেহাত বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সামাজিক স্বীকৃতি যুক্ত, সিঁদুর পরিহিতা স্ত্রী যে কোনোভাবেই পাওয়া সম্ভব নয় তা সৌম্য বুঝেছে বেশ কিছুদিন আগেই, যেদিন রাজীব সরকারি চাকরি পাওয়ার তিনমাসের মধ্যে পরমা সুন্দরী শিক্ষিতা একটা মেয়ে ওর বৌ হয়ে এল।

একই সাথে মোহনদার চায়ের দোকানে চা খেতে যাওয়া ছেলেগুলোর মধ্যে হঠাৎ করেই রাজীবকে মোহনদা মাটির ভাঁড়ে বা প্লাস্টিকের কাপে চা না দিয়ে চিনে মাটির কাপে চা দিলো।

খিস্তি মেরে সুজয় বলেছিল, "বিয়ে করার জন্য মোটা ইয়ে দরকার হয় না, পকেটে টাকা দরকার হয়।"

সৌম্য অবশ্য এসব তর্কে যায়নি, রাজীবের বিয়েতে কব্জি ডুবিয়ে খেয়ে বাড়ি ফিরেছে, আর জমাট অন্ধকারে রাজীবের সুন্দরী বৌকে নিজের কাছে খুঁজেছে বারবার।

(৫)

এই সিজন চেঞ্জের সময় প্রতিবারই অল্প স্বল্প ঠান্ডা লেগে যায় মিতালীর। হাজার প্রোটেকশান নিয়েও কোনোদিন আটকাতে পারেনি এই বিরক্তিকর ঘুষঘুষে কাশিটাকে। ঠিক যেন মনের আয়না, অতীত দেখব না বললেও সেই টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতে চায় ভুলতে চেষ্টা করা অতীতে।

মিতালীকে দেখে কে বলবে ওর মেয়ের বিয়ের বয়স হয়ে গেছে। না, এক্সসারসাইজের উপকার নেই বললে চলবে কেন! সকালের মর্নিং ওয়াক আর সন্ধ্যের এক্সসারসাইজ মিতালীর অনন্ত যৌবনের কারণ।

যদিও কোনোদিন কোনো লেখকের মানস প্রতিমা হয়ে তার লেখনীতে ঠাঁই পায়নি, শুধু পথ চলতি লোকের মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে বারংবার।

আত্মবিশ্বাসই বটে। সেটাও যখন ওকে কুড়োতে হয় হাজার মানুষের ভিড়ে,

তখন ওর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন সেই মানুষটার ভাবলেশহীন চাহনিটা একবার হলেও মনে পড়ে বৈকি।

সাবিত্রী, তুই বরঞ্চ গিজারটা এবার অন করেই দে। হালকা গরমেই শরীরটা আরাম পাবে। ছোট্ট একটা নির্দেশ, অনুরোধের ঢঙে দিয়েই পোশাক চেঞ্জ করতে গেল মিতালী।

আজকাল আর পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না। আলগা হয়ে যাওয়া, মেদ জমে যাওয়া তলপেট আর প্রকট স্ট্রেচ মার্কগুলো হাতছানি দেয় আগামী বার্ধক্যের। স্তনবৃন্তের বাদামি লালচে আভারা অপসৃত হয়েছে, কবেই কালচে ছোপের আধিপত্য সেখানেও। ঝুলপির সিলভার লাইনগুলো কালার দিয়ে ঢাকা, চোখের নিচের ডার্ক সার্কেলও ফ্যাশানেবল গ্লাসের পর্দার আড়ালে।

মনটাই শুধু মাঝে মাঝে বেপরদা হয়ে যায় নিজের কাছে।

মুঠোফোনে তিন্নির নাম দেখলেই হালকা একটা উষ্ণ বাতাস ছুঁয়ে যায় মিতালীকে।

"মাম্মা আমি কলকাতা ফিরছি, অবশ্যই এবার দেখা হবে তোমার সাথে।"

মিতালী গলার অভিমানটা চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, মাম্মাকে মনে থাকলে এসো, গতবার তো বাপির সাথেই দেখা করে ফিরে গিয়েছিলে। মাম্মা তো নামী লেখক নয়, ছাপোষা স্কুল টিচারের অবজ্ঞা সহ্য করার অভ্যেস আছে।

তিন্নি আদুরে গলায় বলল, মাম্মা প্লিস, মিস করছি তোমাকে। কাল এখানে প্যারাডাইসে বিরিয়ানি খেতে গিয়ে অভিককে তো বললাম, মাই মাম্মা ইস এ বেস্ট কুক ইন দি ওয়ার্ল্ড। অভিক তোমার হাতের রান্না খেতে চেয়েছে।

এই অভিকটা ঠিক কে তা তিন্নি এখনো বলেনি। আধুনিক মায়েদের অনেক বেশি ধৈর্যশীল হতে হয়, নিজের গর্ভের সন্তানের প্রাইভেসি নষ্ট হবে এমন কোনো প্রশ্ন করা নিষেধ। কৌতূহল দমন করে অপেক্ষা করতেই হবে মিতালীকে, যবে তিন্নি বলবে।

(৬)

ঘড়িতে এখন সকাল ন'টা। বাবার ডায়াবেটিসের সমস্যাটা ইদানীং একটু ...ড়েছে মনে হয়। রাত একটা নাগাদ বাথরুম করার পরও যখন ভোর ...রটেতে আবার যেতে হচ্ছে তখন মোহিনী নিশ্চিত, এটা রক্তে সুগার বাড়ার ...ক্ষণ। ঘুমের ওষুধ খেয়েও যখন চারটের মধ্যে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বাবার, ...খন নিশ্চয়ই শারীরিক অস্বস্তিটা ভোগাচ্ছে। মায়ের অবর্তমানে মোহিনীই বাবার দেখাশোনা করে। মাত্র ছ'দিনের নোটিসে মা তার সংসারের দায়ভার মোহিনীকে দিয়ে নিশ্চিন্তে চোখ বুজলেন। কলেজের শেষ পরীক্ষাটা আর দেওয়া হয়ে উঠল না মোহিনীর। সংসার বলতে বড় কিছু নয়। প্রাণী বলতে ওরা দু'জন, বাবা আর মেয়ে। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে ধানবাদে। বিবাহিত মেয়েরা একটু একটু করে বাপের বাড়ির সাথে সম্পর্কের সুতোটা কাটতে থাকে, যখনই বুঝতে পারে শ্বশুরবাড়ির অর্থনৈতিক অবস্থা বাপের বাড়ির অপেক্ষা ভালো। হাঁ করা দারিদ্রকে পুজোয় সুতির ছাপা বা রসগোল্লার হাঁড়িতে চাপা দেওয়া যাবে না বুঝেই হয়তো লাটাই এর সুতোটা গোটাতে গোটাতে ঐ নিমন্ত্রণ বাড়িতে লৌকিকতা করার মতো দাঁড়ায়। মোহিনীর দিদিও নিজের সংসার নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে মাসান্তে একবার মুঠোফোনে বাবার শরীরের খবর নিয়েই দায়িত্ব শেষ করে।

দায়িত্বর শেষ অক্ষরটা যেমন জোরালো তেমনি বাস্তব জীবনে এর গুরুত্বও অনেক। এই যেমন মোহিনী বাবার দায়িত্ব নিয়ে নিজের পড়াশোনা, অগোছালো বসন্তকে ত্যাগ করে এই ঘৃণ্য চাকরিটা বেছে নিয়েছে। বাবা জানেন, মোহিনী কোন অফিসের রিসেপসনিস্ট। তা রিসেপসনিস্টই বটে। ফোন কানে নিতে প্রথম প্রশ্নটাই আসে, আপনি কত সাইজের ব্রেসিয়ার ব্যবহার করেন? লো কার্ট না হাই? ঘণ্টা হিসাবে চার্জ নেন, নাকি ফুলপেমেন্ট করে তবে এন্ট্রি নিতে হয়?

একটা হ্যালো বলার পর থেকেই উত্তেজিত মানুষজনের একটাই ইচ্ছে,

মোহিনীই ওদের এটেন্ড করুক। চেহারা দেখে নয় একটা শুধু মহিলা কণ্ঠ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তাদের। আজকাল তাই নতুন কৌশল নিয়েছে মোহিনী, ফ্রেন্ডস ক্লাবের কাস্টোমারদের কোনো কথা বলার সুযোগই দেয় না। ওদের রুলসগুলো ফুলস্টপ না দিয়ে বলে চলে।

এতে অন্তত ফোনগুলোর থেকে নিষ্কৃতি মিলেছে। বাঁচতে পেরেছে সেইসব মানুষগুলোর থেকে, যারা বহুদূর থেকেও হাত দিতে চায় মাহিনীর শ্যামলা বক্ষবিভাজনীতে। ফোনে কথা বলার সময় ওড়নাটা ভালো করে জড়িয়ে নেয় মোহিনী, এটুকুতেই যেন নিরাপত্তা। তাদের নিয়েই সমস্যায় পড়ে মোহিনী যাদের বোঝাতে অসমর্থ হয়, ও রিসেপশনিস্ট, কর্লগার্ল নয়।

(৭)

"কী রে আজ এত সকাল সকাল উঠে পড়েছিস?" সৌম্যর মা জানতে চাইল ওর কাছে। মায়েদের প্রব্লেমটা ঠিক কোথায়? একদিন দেরি করে উঠলে, বেকারত্বের গ্লানি নিয়ে বেলা পর্যন্ত কেন ঘুমোচ্ছে, এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় ওকে।

সস্তার লিকারের রংটা সোনালী না হয়ে ঘোলা কালো হয়। টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের চায়ের রঙের মধ্যে যে আভিজাত্য থাকে সেটা বোধহয় কোনোদিনই মেলা থেকে কেনা দশটাকা জোড়া চায়ের কাপে সম্ভব নয়।

গরম পানীয় গলার মধ্যে উত্তাপের অনুভব দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেল। সৌম্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, বাবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার। ব্যাঙ্কে যাবার ভাবনাটা ধীরে ধীরে অবশ করে দিচ্ছে সৌম্যর কার্যকরী স্নায়ুগুলোকে।

এই ক্লাবে নাকি বেড পার্টনারের ছবি দেখিয়ে কাস্টোমারের পছন্দ অনুযায়ী সঙ্গী গ্রহণের সুযোগ আছে। নিজের মনের গোপন প্রকোষ্ঠে যে নারী মূর্তিটি আঁকা আছে, সৌম্য যাকে রোজ নীলাভ অন্ধকারে কোলবালিশের জমাট তুলোয়

প্রত্যেবার খুঁজে চলে, তাকে যদি একবার চর্মচক্ষে দেখতে পেত।

নারকেল কাঠির ঝাঁটার খচর খচর আওয়াজে সম্বিত ফেরে সৌম্যর। মা উঠোন ঝাঁট দিতে শুরু করেছে। হয়তো কাজের মাসির আসতে দেরি দেখে। সৌম্য বাথরুমে ঢুকতে যাবে ঠিক সেই সময় দিদি ভিজে কাপড়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। সৌম্য চোখ সরিয়ে নিলো দিদির অপুষ্ট একফালি পিঠের দিক থেকে। দিদির সময় মতো বিয়ে হলে, এতদিনে সৌম্যর ভাগ্না-ভাগ্নি মাধ্যমিক দিতো হয়তো।

পাত্রপক্ষ যদি বা বিয়ের পর বাড়ির কাজের লোকের অভাব মিটবে বলে দিদিকে পছন্দ করে তখনই আটকে যায় পণের টাকায়।

বোনটা কলেজে পড়েছে, দেখতে মন্দ নয়। প্রেম করে কাউকে ফাঁসাতে পারলে তবেই বিয়ে হবে, নয়তো দিদির মতোই পড়শীর বিয়েতে গায়ে হলুদের তত্ত্ব সাজাতে হবে।

দিদি আর বোনের কথা মনে পড়লেই গলার কাছে একটা গিলতে না পারা কষ্ট জমাট বাঁধে সৌম্যর। তবে বাড়ির বেকার ছেলেরা আবার অবিবাহিত মেয়েদের থেকেও বেশি বিদ্রুপের পাত্র। পাত্রপক্ষ দেখতে এসে পছন্দ করলেই এক ঝটকায় সেই মেয়েদের কদর বেড়ে যায়, তখন তাকে ভালোমন্দ খাওয়ানো মাখানো চলতে থাকে। বেকার ছেলে সেই অনেকটা জংধরা লোহার মতো। কোনো কাজে লাগে না, অথচ আজ নয় কাল বলে ভাঙাচোরার দলে বিক্রি করাও হয় না।

সৌম্য যখন স্নান করে আয়রণ করা শার্ট-প্যান্ট পরে বেরচ্ছিল, তখন দিদি স্বাভাবিক গলাতেই জিজ্ঞেস করেছিল, "আজ কি কোনো ইন্টারভিউ আছে ভাই? তাহলে ঠাকুর ঘরে একটা প্রণাম করে যাস।" প্রথম প্রথম ইন্টারভিউ-এ যাওয়ার সময় দিদি সৌম্যর কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে দিতো। তারপর যখন বুঝেছিল দইটাও ওয়েস্টেজ হচ্ছে, তখন বন্ধ করে দিয়েছিল ঐ মঙ্গল ফোঁটা।

"... আজ অন্য একটা কাজে বেরোচ্ছি।" বলেই মুখ ফিরিয়ে নিলো

সৌম্য। পবিত্র মানুষের চোখের দিকে তাকালে একটা অস্বস্তি হয়। নিজের অজান্তেই অপরাধবোধে ভুগতে হয়।

(৮)

বাইরের চিৎকারে শতভিষার ঘুম ভাঙল, কোনো একজন মহিলা কণ্ঠ, ওর নাম ধরে ডেকে চলেছে। ফ্ল্যাটের সিকিউরিটি সম্ভবত আটকে রেখেছে তাই এই অসহিষ্ণু চিৎকার।

তিন্নি ব্যালকনিনেতে দাঁড়াতেই বাইরের দৃশ্য পরিষ্কার নজরে এল। অবিন্যস্ত পোশাক, ছিঁড়ে যাওয়া শাড়ির অর্ধেক মাটিতে লুটোচ্ছে, রুক্ষ সোনালী চুল, খসখসে শ্রীহীন রোদে জ্বলে যাওয়া ত্বকের মেয়েটা সকলের নজর এড়িয়ে পৌঁছতে চাইছিল তিন্নির কাছে। কিন্তু কেন? একে তো তিন্নি কোনো দিন দেখেছে বলে মনে করতে পার না।

ফ্ল্যাটের কোলাপ্সিবেলটা টেনে দিয়ে লিফটের সাহায্য ছাড়াই তিন তলা থেকে নিচের গ্যারেজের সামনে নেমে এল তিন্নি।

মেয়েটি তিন্নিকে সামনে দেখে যেন স্বর্গ পেল, হাঁউমাঁউ করে কিছু বোঝাতে চাইছিল, নিজের শুকনো ঠোঁট দুটো বার বার জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছিল।

তিন্নি ওকে শান্ত করে বসালো।

মেয়েটির নাম পূজা, রাস্তার ধারেই ত্রিপল ঘেরা ঝুপড়িতে থাকে। দিন চারেক ধরে ওর এক বছরের বাচ্চাটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। থানায় গিয়েছিল, ওরা কোনো রিপোর্ট নেয়নি। তাই ও তিন্নির দ্বারস্থ হয়েছে।

অভিককে ফোন করতে করতেই পূজার বাসস্থানটা জেনে নিল তিন্নি। বার দুয়েক রিং হবার পর পরিচিত স্বরে হ্যালো বলল অভিক।

ওর সাথে লোকাল থানার বেশ জানাশোনা আছে। অন্তত তিন্নি যে দু'বার অভিকের সাথে গেছে থানায় সেবার অবজ্ঞা পায়নি, বরঞ্চ ভদ্র ব্যবহারই পেয়েছে।

"বলুন ম্যাডাম আপানার জন্য এই অধম কী করতে পারে? একশো আটটা নীল পদ্ম ছাড়া আর সবই জোগাড় করা সম্ভব", মজার সুরে বলল অভিক। তিন্নি সংক্ষিপ্ত রূপে পূজার সমস্যাটি জানাতে ও থানায় ফোন করেছে জানালো।

অভিকের সাথে তিন্নির এই রাস্তার ধারের বস্তিতেই পরিচয়।

একটা বাচ্চাকে বাইকের মুখ থেকে বাঁচিয়ে অভিক ফেরত দিতে এসেছিল তার মায়ের কাছে। তিন্নির হাতে তখন ওদের জন্যই আনা বিস্কিটের প্যাকেট। আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা হতে অবশ্য সময় লেগেছিল বছর খানেক।

আর পাঁচটা গড়পড়তা প্রেমিক-প্রেমিকার মতো বিয়ে, সংসার, পরদা, ফ্রিজের রং নিয়ে ওরা আলোচনা কমই করেছে। এই সুলেমান, কুসুম, রাবেয়া, রহিম আরো নাম না জানা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ঘোরা মানুষগুলোই ওদের আলোচনার বিষয়।

(৯)

মোহনদার চায়ের দোকানে একটা প্যাটিস চিবোতে চিবোতেই হাত ঘড়ি দেখিয়ে দিল কাঁটা দুটো এগারোটার ঘরের দিকে ছুটছে। সৌম্যর অস্থির মনের আগে পৌঁছাতে পারবে বলে মনে হয় না। ব্যাঙ্কের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ঢুকলেই নিজেকে কেমন একটা অর্থবান পুরুষ মনে হয়।

যদিও এখানে যারা লাইন দিয়েছে তারা সবাই যে টাকা সেভিংসের জন্য এসেছে তা নয়। এর মধ্যে অনেকের লোন স্যাংশন আছে, হয়তো নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে চায় অথবা কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা এসে পড়েছে ঐ নীল চুড়িদার স্কুল পড়ুয়া মেয়েটির অ্যাকাউন্টে, তাই তার মুখটায় লেগে আছে উজ্জ্বল হাসি।

'সম্পর্কের' অ্যাকাউন্টে টাকাটা ট্রান্সফার করেই ফোন করতে শুরু করল সৌম্য।

কি অদ্ভুত একটা এমাউন্ট... এক হাজার সাত।

দু'বার সম্পূর্ণ রিং হবার পরও ফ্রেন্ড ক্লাবের কেউ রিসিভ করল না। অধৈর্য লাগছে সৌম্যর।

আজই পৌঁছাতে চায় সেই মহিলার কাছে, যার যোনির গন্ধ ওকে তৃপ্তি দেবে।

তৃতীয় বারে ফোনটা ধরল, মহিলা কণ্ঠ। বোধহয় কাল সন্ধ্যের সেই মহিলা।

কম্পিউটার চেক করছে মোহিনী।

সৌম্য রায়। চন্দননগরের কোন ব্রাঞ্চ থেকে টাকাটা ঢুকেছে?

বিরক্ত হয়ে সৌম্য বলল, কি হলো টাকা তো পেয়ে গেছেন এবার বলুন কোথায় যেতে হবে?

কোনো ওঠানামা ছাড়াই স্থির গলায় মোহিনী বলল, কিন্তু স্যার একটা সমস্যা হয়েছে। চন্দননগরের যে মহিলা আপনাকে ত্রিশ হাজার দেবে আর সেক্সসুয়ালি হ্যাপি করতে পারলে, তার কাছে তো আপনি এখুনি যেতে পারবেন না। রাত আটটার আগে তো ওনার বাড়িতে পাঠানোর পারমিশন নেই। আর আপনি আগামী কালের মধ্যে পঁচিশ হাজারের এমাউন্ট আমাদের ওই অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করুন। আর স্যার আপনি ওনার কাছ থেকে ত্রিশ হাজার ক্যাশে না চেকে নিতে চান সেটাও কাল সকালের মধ্যেই জানাবেন। আমরা সেভাবেই ব্যবস্থা করে রাখবো।

ফোন কেটে গেল। ছ'টাকা আশি পয়সা কেটে নিলো সৌম্যর ফোন থেকে।

(১০)

সাহিত্য মহলে ঠাঁই পাওয়া যে ঠিক কতটা কঠিন তা মৃন্ময় বুঝেছিল ওর প্রবন্ধ 'পৃথিবী সৃষ্টির প্রাক্কালে' প্রকাশের সময়। সম্পাদক মণ্ডলীর অবাক চোখের প্রশ্ন ছিল, গল্প উপন্যাস না লিখে হঠাৎ সৃষ্টি হয়ে যাওয়া পৃথিবীকে নিয়ে লিখলেন কেন?

মৃন্ময় যখন প্রবন্ধটির ছাপার অক্ষরে দেখার আশা প্রায় ত্যাগ করেছিল

...ক তখনই 'জাতীয় প্রকাশন' ওর লেখাটা পাবলিশ করতে রাজি হয়। ওর ওই হতাশার দিনগুলোয় সম্পূর্ণ ভাবে পাশে পেয়েছিল মিতালীকে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়, পরিজন সর্বোপরি কোনো প্রকাশকের বিশ্বাস ছিল না মৃন্ময়ের সৃষ্টিতে, শুধু মিতালী মন থেকে বিশ্বাস করত মৃন্ময়ের কালির আঁচড় একদিন পাঠককুলকে ভাবাবেই।

যে লেখাকে সমর্থন করে মিতালী তাদের বিয়ের পরের স্বপ্নীল রাতগুলোকে অক্লেশে বিলিয়ে দিয়েছে মৃন্ময়ের অক্ষরদের, সেই মিতালীই আবার অস্বীকার করেছে ওদের সামাজিক স্বীকৃতি। সেই রাতের ওই পঁচিশ মিনিটের তরল অন্ধকার বার বার তাড়া করে চলেছে মৃন্ময়কে। ক্ষমা নেই জেনেও ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে ছুটেছিল মিতালীর কাছে। যদি তিন্নির মুখ চেয়েও একটা সুযোগ পাওয়া যেত...

কী করে কল্পনার জাল বুনে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে গল্প আঁকতে হয় মৃন্ময় জানে না। একটা কেন্দ্রবিন্দুকে প্রদক্ষিণ করতে করতে কবে যে প্রাবন্ধিক মৃন্ময় রায়চৌধুরী হয়ে উঠেছে সেটা আজ আর সচেতন ভাবে মনে করতে পারে না ও নিজেই।

যৌবনচ্ছল তরুণীর পরিপূর্ণ দেহাবয়েবের প্রতিচ্ছবি ওর লেখায় নেই। নেই কোনো অনুরাগে ভেজা প্রেম কাহিনী।

শুধু ওর জীবনের সাথে জড়িয়ে গেছে একটা কলেজ ছাত্রীর নাম। সুনয়না মৃন্ময়ের কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। বাংলাকে সে শুধু পড়ার জন্য পড়ে না। সিলেবাস শেষ করার তাড়ায় নাভিশ্বাস তোলে না। দুটো গভীর চোখের কৌতূহলী চাহনিতে সে জানতে চায়, চর্যাপদের সবর-সবরী উদ্দাম যৌবনদর্শন।

মাঝে মাঝেই মৃন্ময়ের বাড়িতে চড়াও হয় সুনয়না। কখনও তার প্রশ্ন থাকে, ছিন্নপত্রাবলীতেই উপন্যাসের বীজ লুকিয়ে আছে এর সঠিক ব্যাখ্যা কি? একটু কি বেশি প্রশ্রয় পায় সুনয়না মৃন্ময়ের কাছ থেকে?

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি চলছিল সেদিন, লোডশেডিং তো ক্ষানিকক্ষণ আগেই হয়েছিল। সুনয়নার আবদারে মৃন্ময়ের স্টাডিতে সেদিন ইনভার্টারের সুইচ অফ,

মোমবাতির আলোয় বিদ্যাপতির পদের পর্যলোচনা চলছিল অসমবয়সী দুই সাহিত্যপ্রেমীর মধ্যে।

মিতালী তিন্নিকে নিয়ে গানের স্কুলে গিয়ে বৃষ্টির জন্য আটকে গিয়েছিল। সুনয়নার গায়ের পারফিউমের গন্ধটা ভেজা মাটির গন্ধ ছাপিয়ে মৃন্ময়ের নাকে ঝাপটা দিচ্ছিল। আজকালকার ভেজাল সুগন্ধিতেও কি মৃগনাভীর মতো দুর্লভ জিনিস দেওয়া থাকে? শ্রীরাধার শরীরের বর্ণনার সাথে সুনয়নার বক্ষবিভঙ্গ মিলে মিশে একাকার হয়ে মাতাল করে দিয়েছিল বিগত যৌবন মৃন্ময়কে। অদ্ভুতভাবে সুনয়নাও কোনো বাধা দেয়নি। যেন আরো তীব্রভাবে আকর্ষণী ক্ষমতা দিয়ে আকৃষ্ট করেছিল এক মধ্যবয়স্ক পুরুষকে।

কপালের বিন্দু বিন্দু ঘামে আর রক্তের দাপাদাপিতে অসহ্য তৃপ্তিতে খাদের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মৃন্ময় বুঝেছিল, চরম ভুলের মুহূর্তটা পেরিয়ে গেছে।

কোনো কথা না বলে, নিজের সালোয়ারের বোতাম আটকাতে আটকাতেই ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল দশমিনিট আগেই নিজের কৌমার্য হারানো সুনয়না।

দরজার সামনে মিতালী এসে পৌঁছেছিল। হয়তো ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সুনয়নার ভীরু দৃষ্টিকে চিনে ফেলেছিল। আন্দাজ করেছিল ঘটনা প্রবাহের।

(১১)

মিথ্যে কথা বলতে বলতে প্রায় ক্লান্ত মোহিনী, একটা যদি চাকরি জোগাড় করতে পারতো তাহলে এই নরক থেকে উদ্ধার পেতো।

সকলের কাছে কমলা সূর্যরশ্মি একটা নতুন সকাল বহন করে নিয়ে আসে। ব্যতিক্রমী বোধহয় মোহিনী। রাতের গাঢ় অন্ধকার ফর্সা হয়ে যখন পূব আকাশ একটু একটু করে রেঙে ওঠে, তখনই মোহিনী বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে, আজ তাকে আর কত পাঁক ঘাঁটতে হবে।

পাশের ঘর থেকে বাবার এক নাগাড়ে কাশির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। রাত পোশাকে খুব সাধারণ দেখতে মেয়েকেও খুব অসাধারণ লাগে। যদিও

মোহিনীর নাইটিটা নেহাতই চৈত্রসেলে কেনা সস্তার। তবুও ঘুম চোখে বিবর্ণ আয়নার সামনে দাঁড়ালে আয়না একটু মুচকি হেসে বলে, মন্দ নয়। সেটা দর্পনের বিচারের ভুল, নাকি মোহিনীর দৃষ্টি ভ্রান্তি তা বুঝতে পারে না মোহিনী।

মোহিনীদের বাড়ির ঠিক সামনেই ছিমছাম একটা দোতলা বাড়ি। বাড়ির বাসিন্দা একজন নামি লেখক। যদিও মোহিনী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস ছাড়া তেমন বই পড়েনি। এই মৃন্ময় রায়চৌধুরীর কোনো উপন্যাসও কোনোদিন চোখেও দেখেনি। ভদ্রলোক একাই থাকেন। সঙ্গে একজন বয়স্ক কাজের লোক। ডিভোর্সি বোধহয়। মধ্যবিত্ত ঘরে ছাড়াছাড়ি হলে, লোকের সমালোচনার বিষয় হয়ে যায়, কিন্তু উচ্চবিত্তদের ডিভোর্সটা শীতকালে গাছের শুকনো পাতা ঝরার মতোই অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

কানাকানির দৌলতে এ চত্বরে মানুষের বেশ আগ্রহের বিষয় ঐ লেখক। তবে শুনেছে নাকি মানুষের বিপদের দিনে মৃন্ময়বাবু পাশে থাকেন।

চারপাশের লোকের আলোচনা বা সমালোচনা থেকে এটুকু জানা যায়, অধ্যাপক এবং লেখক মৃন্ময়বাবুর স্ত্রী নাকি ছাত্রীর সাথে ওনার সম্পর্ক আছে এই সন্দেহে বাড়ি ছেড়েছেন। মাঝে মাঝে একটি মধ্য বয়সী মহিলা বাড়ির গেট দিয়ে বেরিয়ে যান, তিনি মৃন্ময়বাবুর স্ত্রী না ছাত্রী তা মোহিনীর জানা নেই। জানার আগ্রহও অবশ্য নেই।

বড়লোক, নামী মানুষদের নিয়ে মোহিনীর আজকাল কোনো ইন্টারেস্ট নেই। মোহিনীর ধারণায় সকলের দৃষ্টিই মেয়েদের শরীরের দিকে।

(১২)

নিজের পুরুষত্ব বেচে রোজকার? শুধু সুখের সন্ধান নয় অর্থের আগমনও হয় তাহলে? সমস্যাটা হলো, সৌম্য কোনো বন্ধু বা পরিচিতের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতেই পারছে না। এমন কি আজ সকালে ফোন করলেও এখনো যার উপস্থিতি প্রসকোয়াটারে তেমন বন্ধুকেও জিজ্ঞেস

করতে পারছে না কারণ সে চমকে উঠে বলবে, সৌম্য তুই? তুই যাবি ওসব প্রফেশনালদের কাছে?

যেন সৌম্য অন্য গ্রহের পুরুষাঙ্গহীন কোনো জীব।

আরও একটা নিঃসঙ্গ রাতের পরিকল্পনা, যেখানে সৌম্য অজান্তা গুহাচিত্রের নগ্ন নারীকে তৃপ্তি দিচ্ছে, নরম শরীরটি তৃপ্তির শিহরণে শিউরে উঠছে বারংবার।

রতিক্রিয়ার পর সেই মহিলার কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নেওয়াটা একটা বর্বর অসভ্যতা হয়ে যায় বোধহয়।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পত্র মিতালী দেখে ফোনটা যখন করেছিল সৌম্য, ভেবেছিল হয়তো কোনো একটা নির্দিষ্ট মেয়ের নম্বর, এটা যে কোনো ফ্রেন্ড ক্লাব সেটা ও বুঝতে পারেনি।

চারদিকে এই ফ্রেন্ড ক্লাবগুলো যখন গজিয়ে উঠছে এবং রমরম করে চলছে তখন কাস্টমার নিশ্চয় সৌম্য একা নয়।

সৌম্যর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সাকুল্যে আঠেরো হাজার পড়ে আছে, কিন্তু আপাতত ওর দরকার পঁচিশ হাজার। আরো সাত হাজার! বেকার ছেলেদের ধার দেবার বন্ধুও খুব কমই থাকে। মাসের প্রথমে মাইনে পেয়ে শোধ দেবার নির্দিষ্ট কথা থাকে না যে।

ফ্রেন্ড ক্লাবের কথা মতো পঁচিশ ডিপোজিট করলেই ত্রিশ ফেরত পাবে সৌম্য। পাঁচ হাজার ওর লাভ, কিন্তু ওই সাত হাজার দু'দিনের জন্য ধার দেবে কে?

হরি জ্যাঠাকে একবার বললে হয়, বুড়ো দীর্ঘদিন ধরে প্রফেসরের বাড়িতে চাকরি করছে, জমিয়েছেও প্রচুর। বুড়োর তিনকুলে কেউ নেই। সৌম্যর নিজের জ্যাঠা নয়, বাবার খুড়তুতো সম্পর্কের। তবে ছোট থেকেই সৌম্যকে বড় ভালোবাসেন। যখনি দু একদিনের ছুটিতে সৌম্যদের বাড়ি আসেন তখনি ওর হাতে কিছু করে টাকা দিয়ে যান।

ঘুম থেকে উঠে যখন হরি জ্যাঠার মুখটা মনে পড়ল তখন একবার ফোন ঘেঁটে জ্যাঠার ফোন নম্বরে একটা ফোন করতে ক্ষতি কি?

(১৩)

দাদাবাবু আপনার ঘরে এখনো আলো জ্বলছে, কত রাত হলো খেয়াল আছে? হরিপদর সাধারণ গলাতেও কেঁপে উঠল মৃন্ময়। ভাবনার অতলে ঝাঁপ দিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল অনেকগুলো বছর আগে। ফিরতে সময় লাগল একটু।

লেখার পাতায় দু একটা হাবিজাবি লাইন ছাড়া আর কিছুই লিখতে পারেননি সেটা খেয়াল হলো এখন। ধীরে ধীরে নিজের বেডরুমের দিকে এগোতে থাকলেন। বিছানায় শুয়েও ঘুমের প্রতিক্ষায় কাটবে আবার একটা নির্ঘুম রাত।

(১৪)

ক্ষমা তো কবেই করে দিয়েছে মৃন্ময়কে, কিন্তু সেই স্বাভাবিক সম্পর্কটা আর কোথায়?

মাঝে মাঝে ওর বাড়িতে গিয়ে আত্মীয়দের মতো কয়েকঘণ্টা কাটানো, তাও তো সেটা শুধু তিন্নিকে নিয়ে আলোচনার জন্যই। মিতালী বুঝতে পারে ভিতরে ভিতরে ক্রমাগত ক্ষয় হয়ে চলেছে মৃন্ময়। নিজেও কি কিছু কম ছাড়লো জীবনে।

(১৫)

পূজার সত্যিই সন্তান চুরি গেছে নাকি ওর মনের বিকৃতি সেটা এখনো পরিষ্কার নয় অভিক আর তিন্নির কাছে। আগামীকাল ওদের কলকাতায় ফেরার দিন।

অভিকের সাথে বাবা আর মায়ের পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা এবার একটু আবশ্যক হয়ে পড়েছে। ফ্লাইট লেট না করলে ওরা সকাল ন'টার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাবে। অভিক যাদবপুরে ওর দাদার বাড়িতে দু'দিন থেকে শ্রীরামপুরে ওদের দেশের বাড়িতে ফিরবে। তিন্নি এখনো নিজের পনেরো দিন ভাগ করেনি। ক'দিন বাবা আর ক'দিন মায়ের কাছে থাকবে তার সিদ্ধান্ত এখনো নেওয়া

হয়নি ওর। তবে ও আর অভিক দিন তিনেক কলকাতার রাস্তায় অন্ধকারে ঘুরে বেড়াবে ফুটপাত ধরে। রাতের তিলোত্তমা নগরীর আলোর আড়ালে অন্ধকারটাকে খুব কাছ থেকে দেখবে বলে।

(১৬)

খুব সাবধানে ফোন করল মিতালী। মৃন্ময়ের কাছে ওর এই একাকীত্ব যেন কোনো ভাবেই প্রকটিত না হয়ে পরে।

মৃন্ময়ের গলাটা শুনলে মিতালীর আজও হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, এটুকুকে আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা করে ভীষণ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, কাল তিন্নি আসছে। আমি চাই এই ক'টা দিন একসাথে থাকতে। আমাদের ভাগাভাগির মধ্যে মেয়েটা কষ্টে না পড়লেই ভালো হয়।

মিতালীর কথাগুলো ভোরে স্নিগ্ধ আলোয় একটা অদ্ভুত মায়ার আকার নিলো। এইটুকু ক্ষমাও যে মিতালী মৃন্ময়কে করেছে এতেই সে ধন্য।

আগ্রহের সাথে মৃন্ময় বলল, গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি তোমার ক'দিনের লাগেজ নিয়ে চলে এসো।

বেশ কিছুক্ষণের নীরবতার পরে বিচ্ছিন্ন হলো ফোনের কানেকশন।

(১৭)

রিং বাজছে হরিপদ জ্যাঠার ফোনে, একটা বেশ গম্ভীর গলায় কেউ হ্যালো বলল। এই গলাটা আর যারই হোক হরি জ্যাঠার অন্তত নয়। নম্বরটা ঠিক ডায়াল করেছে কিনা সন্দেহ হওয়ার সাথে সাথেই ওদিকের গলায় বিরক্তি ঝরে পড়ল। দ্বিতীয়বার হ্যালোটা আর প্রথমের মতো মোলায়েম নয়।

হরিপদ জ্যাঠা আছেন?

কোনো দ্বিতীয় কথা ছাড়াই হাঁক পাড়লেন ভদ্রলোক, এই হরিপদ কেউ তোকে ফোন করেছে, ধরে কথা বল।

হরি জ্যাঠা খুব আড়ষ্ঠ গলায় বলল, কে বলছো?

সৌম্যর নাম শুনে খুব অবাক হয়েছে সেটা নিঃশ্বাসের ওঠানামাতেই পরিষ্কার হলো।

সেটুকুকে খুব সাবধানে গিলে নিয়ে হরি জ্যাঠা বলল, বল রে কী দরকার সৌম্য তোর?

সৌম্য ভূমিকা না করেই বলল, 'হরি জ্যাঠা মাত্র তিন দিনের জন্য হাজার সাতেক ধার দিতে পারবে?"

হরি জ্যাঠার কাছেও যে কেউ ধার চাইতে পারে তা বোধহয় উনি নিজেও জানতেন না। বাবু একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছেন ব্যাঙ্কে, সেখানে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে সইও করে। কিন্তু ঠিক কতটাকা সেখানে জমেছে তার হিসেব তো কিছুই জানে না সে।

একটু উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইলেন, "হ্যাঁরে বাড়ির সবাই ভালো তো?"

সৌম্য ওকে নিশ্চিন্ত করে বলল, "টাকাটা আমার দরকার জ্যাঠা।"

কাল সকাল দশটার পরে ওই প্রফেসরের বাড়িতে আসতে বলে ফোন রাখল জ্যাঠা।

ব্যাঙ্কের পাশ বইটা সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল সৌম্য। হরি জ্যাঠার মালিকের বাড়ি হয়ে ব্যঙ্কে যেতে হবে। মাত্র দু'দিনের মধ্যে নিজের পঁচিশ সহ আরো পাঁচ লাভ হবে। এই পাঁচ হাজার না হয় দিদির হাতে দিয়ে দেবে সৌম্য। আর ব্যাঙ্কে আঠেরো আবার রেখে দেবে নিঃশব্দে।

রাত আটটায় যে মহিলার সাথে আজ ওর দেখা হবে সে ঠিক কি ধরনের পারফিউম ব্যবহার করে সেটা ভাবতে ভাবতেই পৌঁছে গেল বাড়ির বাগান ঘেরা পাঁচিলের সামনে।

হরি জ্যাঠা বাজারের ব্যাগ হাতে গেটের দিকেই আসছিল। সৌম্যকে দেখে ভিতরে আসতে বলল। একটু অস্বস্তি হচ্ছে, সামনা-সামনি হরি জ্যাঠার চোখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে বলে টাকাটা নিতে। বাড়ির ভিতরে অল্পবয়সী ভীষণ

স্মার্ট একটা মেয়ে আর একজন ষাট ছুঁই ছুঁই রাশভারী ভদ্রলোক বসে আছেন সামনের সোফাতে। হরি জ্যাঠা পরিচয় করিয়ে দিলো নিজের ভাইপো বলে। বাধ্য হয়ে প্রফেসরকে প্রণাম করতে হলো সৌম্যকে। অল্প বয়সী মেয়েটি, একটু উচ্ছ্বাসের সাথে জিজ্ঞেস করল, আপনি কলকাতাতেই থাকেন? স্ট্রিট বেগার্স সম্পর্কে আমাকে কিছু তথ্য দিতে পারবেন?

সৌম্য হরি জ্যাঠার কাছ থেকে ধার চাইতে এসেছে বলে কি মেয়েটা ওকে রাস্তার ভিখিরি ভেবেছে নাকি?

প্রফেসর এবার গুরুগম্ভীর গলায় বললেন, তিন্নি তুমি কি মানুষ দেখলেই এই আলোচনা শুরু করবে? কোথায় কী অপরাধ ঘটে চলেছে তার সব তুমি একাই সল্যুশন করবে ভেবেছো? বেগার্সদের বাচ্চা চুরির অপরাধীদের শাস্তি দেবার জন্য দেশে আইন কানুন আছে।

তিন্নি বলে মেয়েটা মাথা নিচু করে, সৌম্যর দিকে তাকিয়ে সরি বলল।

হরিজ্যাঠা একটা সাদা খামে ভরে টাকাটা নিয়ে এসেছে। টাকাটা হাতে নিয়ে সৌম্য বলল, জ্যাঠা তিন দিনের মধ্যে এসে ফেরত দিয়ে দেবো।

আবার ঐ তিন্নি হেসে বলে উঠল, তাহলে তো তিনদিন পরই আপনি কাজটা করতে পারতেন, তা হলে আর লোকের কাছে হাত পাততে হতো না?

কানগুলো অপমানে লাল হয়ে উঠল সৌম্যর। মাথা নিচু করে গোলাপের বাগানের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল ও।

বাইরে বেরিয়েই ফ্রেন্ড ক্লাবে ফোনটা করল ও।

এবার আর গলাটা চিনতে অসুবিধা হলো না।

গত চারদিন ধরে এই মেয়েটির কথাই শুনে আসছে ও। এমনকি ওর গলা শুনে ওর চেহারাও কল্পনা করে ফেলেছে সৌম্য।

অ্যাকাউন্ট নম্বরটা বার দুয়েক বলল মেয়েটি। যে নম্বরে এখুনি পঁচিশ হাজার টাকা ডিপোজিট করতে হবে ওকে।

রাত আটটায় ওর নম্বরে ফোন করে ওরাই জানিয়ে দেবে, ঠিক কোন অ্যাড্রেসে ওকে যেতে হবে।

(১৮)

এতদিন ধরে এই সেন্টারে কাজ করছে মোহিনী, কোনোদিন ওর মনে হয়নি বেশ কিছু মানুষ তাদের উপার্জিত অর্থের বিনিময়ে প্রবঞ্চিত হচ্ছে। আর পরোক্ষভাবে এই প্রবঞ্চনা করে চলেছে মোহিনী নিজেও। আজ ওই সৌম্য নামের ছেলেটার সাথে কথা হবার পর বারবার মনে হচ্ছে, একে ফোন করে জানানো দরকার, যে সে ওদের পাতা নিখুঁত ফাঁদে পা দিয়েছে। সৌম্যর নাম্বারটা টাইপ করতে গিয়ে ওর মনে পড়ে গেলো, ওষুধের দোকানে বেশ কিছু টাকা ধার আছে। কাল মাইনে পেলে তবেই শোধ করে বাবার জন্য নতুন ওষুধ কিনতে হবে। মোহিনী ধীরে ধীরে নিজের ফোনের স্ক্রীন থেকে মুছে দিলো কাস্টোমারের নাম্বারটা। ওর নিজের ভাগ্যও তো বিট্রে করেছে ওকে। তাহলে আর কার প্রবঞ্চনা আটকাতে যাবে মোহিনী।

(১৯)

পুরো পঁচিশ হাজার রজত চৌধুরির অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করার সময় ছোট বোনটার ভাঙা সাইকেল, দিদির সাদা সিঁথি আর বাবার দম দিয়েও না চলা ঘড়িটার কথা বড্ড মনে পড়ছিল সৌম্যর।

তবে ত্রিশ হাজার তো আজ রাতেই পেয়ে যাবে তখন না হয় বাবাকে একটা ঘড়ি কিনে দিলেই চলবে।

সন্ধ্যে সাতটার থেকেই নিজের শরীরের একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল সৌম্য। ব্লু ফিল্ম বা পর্ন বই পড়ার থেকেও অন্য রকম এক অনুভূতি। যদি ওই মহিলাকে সেক্সসুয়ালি হ্যাপি করতে না পারে, যদি সে ত্রিশ হাজার না দেয়! এতদিন শারীরিক উত্থান-পতনগুলো ছিল ওর একান্ত নিজস্ব চিন্তা ভাবনার। কল্পনায় নারী শরীরকে উপভোগ করা, আর বাস্তবে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতাকে এতটা কাছ থেকে পাওয়ার মধ্যে তফাতটা সৌম্যকে বেশ ভাবাচ্ছে।

আটটা বেজে গেল, বারবার নেটওয়ার্ক চেক করছে সৌম্য। না কোনো ফোন ঢোকেনি ওর ফোনে ঐ নম্বর থেকে।

সাড়ে আটটায় ওদের সেন্টারে ফোনটা বেজেই গেল। কেউ রিসিভ করল না।

আধঘণ্টা অন্তর অন্তর ফোন করেই চলল সৌম্য।

আজ আর অন্ধকার বিছানায় কোনো পেলেব মসৃণ শরীরের কল্পনা নেই, শুধু পঁচিশ হাজারের একটা হিমশীতল স্রোত ওর পিঠের ভিতর দিয়ে সিথিল যৌনাঙ্গকে অতিক্রম করে বারবার নেমে যাচ্ছে। বাবা, মা, হরিজ্যাঠা এমন কি ঐ প্রফেসরের স্মার্ট মেয়েটা পর্যন্ত যেন নিষ্ঠুরভাবে হাসছে ওকে দেখে। কী ভীষণ ভাবে ঠকে গেছে ও।

বিদ্রুপ করছে, বিবাহযোগ্যা দিদির ক্লান্ত হাসি।

ঘামে শপশপে হয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল সৌম্যর। মানবাধিকার কমিশনের কাছে যাবে ও, কেস করবে এই সব ফ্রেন্ড সেন্টারের বিরুদ্ধে?

থমকে গেল ওর ভাবনা।

কাগজের প্রথম পাতায় হয়তো উঠে আসবে ওর বিকৃতকাম মানসিকতা। আড়ালে আবডালে ওর বাবাকে দেখে লোকে আলোচনা করবে, এর ছেলে টাকার বিনিময়ে বেচতে গিয়েছিল নিজের পুরুষত্ব।

প্রফেসরের মেয়ের কাছে গেল হয় না, সে নাকি ঠকে যাওয়া, বঞ্চিত হওয়া মানুষদের নিয়ে লড়ছে।

ফোনটা বাজছে ভোর রাতে।

(২০)

আজ কনফেস করবে মোহিনী ঐ সৌম্য বলে ছেলেটার কাছে। চাকরিটা ছেড়ে দেবে মোহিনী। রান্নার কাজ নেবে লোকের বাড়িতে, অথবা নিচু ক্লাসের টিউশনি।

(২১)

অভিকের একটা অদ্ভুত মিশুকে ক্ষমতা আছে। অনেকদিন পর মৃন্ময় আর মিতালী একই সাথে হেসে উঠল। তিন্নির মুখেও একঝলক আবীরের ছোঁয়া লক্ষ করল মিতালী। মৃন্ময়কে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আলতো করে ওর হাতের আঙুলগুলো ছুঁয়ে দিলো মিতালী।

হন্তদন্ত হয়ে একজন ছেলে আর একটা মেয়ে গেট খুলে সটান এগিয়ে আসছে ওদের বসার ঘরের দিকে।

ছেলেটি তো গতকালই এসেছিল, হরিপদ জ্যেঠুর ভাইপো নাকি যেন।

মোহিনীর বলে দেওয়া অ্যাড্রেস আর প্রফেসরের বাড়ির ঠিকানাটা একই ছিল। প্রথমে মোহিনী সৌম্যর কেস করার কথায় আপত্তি করেছিল। কিন্তু সৌম্যর নিজের সম্মান বাজি রেখে এই লড়ার মানসিকতাটা ওকে উদ্বুদ্ধ করেছে বোধহয়।

হরিজ্যাঠা চারটে গ্লাসে ঠান্ডা শরবত রেখে গেছে। অভিক আর শতভিষা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবটা শুনল সৌম্যর কাছ থেকে। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার মোহিনীর দেওয়া অ্যাকাউন্ট নম্বরগুলো সবই প্রায় বেনামে। ওই অ্যাকাউন্টের টাকা যে ঠিক কোথায় যায় তা মোহিনীও জানে না। এমনকি মোহিনী ওই সেন্টারের মাইনের যে পদ্ধতি বলল, সেটাও নাকি মোহিনীর অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়। মাঝে মাঝে শুধু একটা অজানা নম্বর থেকে ইনস্ট্রাকশন আসে মোহিনীর কাছে। আদৌ কোনো সেক্সকর্মী সত্যিই সশরীরে আছেন, নাকি ঐ নামগুলো কল্পিত তারও সঠিক ধারণা নেই মোহিনীর।

প্রথম দিন যে ভদ্রলোক ওর ইন্টারভিউ নিয়েছিল তাকে আর এই ক'মাসে দেখেনি মোহিনী। অভিক ভ্রূ কুঁচকে বলল, দেখলেও আর চিনতে পারবে না হয়তো। ছদ্মবেশে ছিল নিশ্চয়। মোহিনীর দেওয়া প্রতিটি ফোন নম্বরে

তিন্নি ফোন করে চলেছে, রেজাল্ট একই। তাদের কোনো অস্তিত্ব বাস্তবে নেই। হাল ছাড়া গলায় সৌম্য বলল, তাহলে দিনের পর দিন মানুষগুলোকে প্রলোভন দেখিয়ে সর্বশান্ত করবে এরা?

তিন্নি আর অভিক এক সাথে বলে উঠল, তোমাদের সত্য খোঁজার লড়াইয়ে আমরা দু'জনও সঙ্গী হলাম আজ থেকে।

(২২)

অনেকদিন পর মিতালী আজ রান্না ঘরে ঢুকে অপরিচিতের মতো এদিক সেদিক তাকাচ্ছে। ষোলো বছর আগের রেখে যাওয়া ওর একান্ত জায়গাটা একটুও বদলায়নি যেন। শুধু একটা কালবৈশাখীতে একটু এলোমেলো করে দিয়েছিল।

মৃন্ময় খাতার পাতায় আজ আর অযথা আঁকিবুঁকি কাটছে না। লিখতে শুরু করেছে নতুন লেখার প্রথম লাইন।

মোহিনী আর সৌম্য বাগানের হাসনুহানার গন্ধটা ঘ্রাণে মিশিয়ে নিতে নিতে এগিয়ে চলল এক সাথে পা মিলিয়ে। ঈশ্বরের গোপন অভিসন্ধিতে হয়তো সৌম্য আর মোহিনীর আলাপটা একটা সম্পর্কের সূচনা করতে চলেছে।

তেরোটা বছর

নতুন স্কুল, নতুন চাকরি, স্বাভাবিক ভাবেই একটু ভয় জনিত উত্তেজনা কাজ করছে মোহরের মধ্যে। অন্য শিক্ষকরা ঠিক কেমন জানা নেই ওর। ক্লাস ফাইভে যখন নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েছিল তখন যেমন অনুভূতি হয়েছিল সেরকম নয়, তবে একটু অস্থির অস্থির তো লাগছেই। ফরম্যালিটিস মেইনটেন করে তারপর টিচার্স রুমে বসে আছে মোহর। আজ ওকে কোন কোন ক্লাস নিতে হবে সেটা বুঝিয়ে দেবেন কেকাদি মানে এসিস্ট্যান্ট টিচার। তিনি এখনো অফিসে ঢোকেননি। তাই অপেক্ষা...

তিনজনের সাথে অলরেডি আলাপ হয়েছে, তার মধ্যে অর্চনাদি বেশ মিশুকে, বাকি দু'জন নতুনকে অত প্রায়োরিটি দিতে নারাজ।

ঘরে ঢুকলেন কেকাদি।

এই মহিলাকে বড্ড চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু কিছুতেই চিনে উঠতে পারছে না মোহর।

অনেকক্ষণ একই দৃষ্টিতে অপরিচিত মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকাটা ভীষণ অশোভন তাই দৃষ্টি সরিয়ে নিল মোহর।

কেকাদি সাবলীল ভাবে বললেন, আজ তো নতুন ...তাই ফাইভ, সিক্সের ক্লাস দিলাম না। বিচ্চুগুলোকে না হয় তিন দিন পর থেকেই হ্যান্ডেল করো। মুখে মৃদু একটা হাসি ঝোলানো আছে মহিলার। বয়স প্রায় চল্লিশ কি তার একটু কমই হবে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

অনেক মহিলাই যেমন নিজের বয়স ঢাকতে উগ্ররঙকে সঙ্গী করেন, কেকাদি

তা নয়। একটা হালকা আকাশী তাঁতের জামদানী পরেছেন, গলায় আর কানে হালকা মুক্তোর একটা সেট। এক হাতে রিস্টওয়াচ অন্যটাতে সরু চুরি একগাছা।

মহিলাকে এক ঝলক দেখেই মোহরের পঁচিশ বছরের চোখে যেটা মনে হলো সেটা হলো, ওর বয়সে মহিলা অনেকের হার্টথ্রব ছিলেন। হয়তো এককালে ওনাকে দেখে অনেকেই 'কে তুমি নন্দিনী' আওড়াতেন। কেকাদি নাম প্রেজেন্টের খাতাটা মোহরের হাতে তুলে দিয়েই ফোর্থক্লাস স্টাফ রমলাকে হাঁক পাড়লেন, নতুন ম্যাডামকে সেভেন এ'তে পৌঁছে দিয়ে এসো।

মোহরের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, বেস্ট অফ লাক। মোহরের মাথার মধ্যে তখনও অস্বস্তিটা চলতেই থাকছে, কেন এত পরিচিত মনে হচ্ছে কেকাদিকে! ওর পরিচিত কোনো মুখের সাথে কি সামঞ্জস্য রয়েছে কেকাদির। নিজের পিসি, মাসি, গানের দিদিমনি মোটামুটি ঐ বয়সের সকলের মুখই একবার করে ভেবে নিল মোহর। একমাত্র ওর ছোট মাসির সাথেই একটু-আধটু মেলে, কিন্তু ছোট মাসির রঙ কেকাদির মতো আকর্ষণীয় নয়। কেকাদি দুধে আলতা ফর্সা নয় কিন্তু একটা বাদামী জৌলুশ... যেন ওনার ব্যক্তিত্বকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

কেকাদির কথা ভাবতে ভাবতেই নতুন ম্যাডাম ঢুকল ক্লাস সেভেনের বাংলার ক্লাসে।

নতুন ম্যাডাম দেখে স্টুডেন্টদের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। মোহরদের স্টুডেন্ট লাইফেও এটা ঘটতো। প্রথম দিন পড়তে ইচ্ছা করতো না। নতুন ম্যাডামের সাথে গল্প করতে ইচ্ছা করতো।

এই ক্লাসেরও তাই ইচ্ছে। মোহর কিছুটা গল্প করে, কিছুটা পড়িয়ে কাটাল ওদের সাথে। তারপর গিয়ে ঢুকল ক্লাস নাইনের ইতিহাস ক্লাসে। যাক এতক্ষনে নিজের সাবজেক্ট পেয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল ওর।

বইয়ের পাতায় একটা গ্রিক ভাস্কর্যের ছবি। মোহরের মাথায় কোনো গোপন প্রকষ্ঠে রাখা আরেকটি মুখ উঁকি দিয়ে গেল। এমনি কাটা কাটা তীক্ষ্ণ একটা মুখ, এমনি বলিষ্ঠ শরীর। চোখের চাহনিতে আত্মবিশ্বাস।

ওহ মনে পড়েছে, ওদের জিমনাস্টিক ক্লাসের রজতকাকু। রজতকাকুর ঠিক পাশেই দেখেছিল একটা অল্প বয়সী তরুণীকে। তখন মোহর ক্লাস সেভেনের ছাত্রী।

রজতকাকুর সাথে মোহরের বাবার সম্পর্কটা বরাবরই নিজের ভাইয়ের মতোই। তাই মোহরকেও কাকু ভীষণ ভালোবাসত।

ম্যাডাম, আপনার বাড়ি কোথায়? বাড়িতে কে কে আছে? কৌতূহলী স্টুডেন্টদের কৌতূহল মেটানোটাও মোহরের দায়িত্ব।

টিচার্স রুমে ঢুকতেই কেকাদি বললেন, কেমন হলো প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা?

মোহর হেসে বলল, স্টুডেন্টরা আজ চূড়ান্ত স্মার্ট আমিই একটু নার্ভাস ছিলাম। ওর উত্তর শুনে কেকাদি একটু হাসলেন, দৃষ্টিটা দেখে মনে হলো নিজেও বোধহয় নিজের জয়েনিং ডেটের কথা ভাবছিলেন।

গলার বাঁদিকের তিলটা আরো সন্দেহ মুক্ত করল মোহরকে, কিন্তু প্রথম দিনেই অল্প আলাপে কিছু জানতে চাওয়াটা বড় বেমানান।

যদিও মোহর আর পুরনো পাড়ায় থাকেও না, চলে এসেছে নতুন ফ্ল্যাটে। তাছাড়া হয়েও গেল তো বারো তেরো বছর আগেকার ঘটনা। কি একটু তার বেশিই হবে। রজতকাকু আর মোহররা একই পাড়ায় থাকতো, রজতকাকু বাবার থেকে অনেকটাই ছোট ছিল, তবুও কি করে যে বাবার চা খাবার বন্ধু হয়ে গিয়েছিল তা মন্টুদার চায়ের দোকানের লিকার চা-ই জানে। রজতকাকু কবি সুকান্ত ক্লাবে জিমনাস্টিক শেখাত। পাড়ার ছেলে মেয়েরা শিখতে যেত। মেয়েদের ক্লাস ছিল বিকালে আর ছেলেদের সন্ধ্যেবেলা। মোহরকেও ক্লাস সিক্সে বাবা রজতকাকুর ক্লাবে ভর্তি করে দিয়েছিল। কাকু যখন একবারও না থেমে ভোল্ট মারতো তখন মোহর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো। কাকুর পেশীগুলো পরিশ্রমে ফুলে উঠতো। মোহরের কাকু হলেও পাড়ার বেশিরভাগ মেয়ের যে রজতকাকুকে পছন্দ ছিল সেটা বুঝতেও পারতো মোহর। ওদের

পাড়ার চন্দ্রাদি মোহরের হাত দিয়েই তো কাকুর জন্য চিঠি পাঠিয়েছিল। কাকু মোহরের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, শোন পাগলী তোকে যদি কেউ এসব চিঠি দেয় তুই নিবি না। বলবি, আমাকে কাকু বকবে।

কৌতূহলবশে চিঠিটা ফাঁক করতেই 'ভালোবাসি' কথাটা দেখে ফেলেছিল মোহর।

ওর কিশোরী মনে তোলপাড় হয়েছিল, তার মানে চন্দ্রাদি রজতকাকুকে ভালোবাসে?

পাড়ার অনেক দিদিই রজতকাকুর সম্বন্ধে মোহরের কাছে খোঁজ নিত। সকালের দিকে বোধহয় কাকু একটা বেসরকারি ফার্মে চাকরি করতো, বিকালের দিকে জিমনাস্টিক ক্লাস।

কাকু যে মজার মজার কথা বলতো, সেটা মোহর শুনলেও ক্লাবের কেউই খুব একটা শুনতে পেতো না কারণ ক্লাসে কাকু ভীষণ ডিসিপ্লিন মেইনটেইন করতো।

তখন মোহর ক্লাস সেভেন কি এইটের ছাত্রী হঠাৎ একদিন রাধামাধবের পুরোনো মন্দিরটার সামনে একটু আলো আঁধারিতে দেখল, রজতকাকুর সাথে একজন ভীষণ সুন্দরী তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। কাকু হয়তো মোহরকে খেয়াল করেনি কিন্তু মোহর মুগ্ধ হয়ে দেখছিল, মেয়েটির হাতের ওপর কাকুর হাত। না ঠিক হাত ধরে আছে এমন নয়, বোধহয় কোনো প্রতিশ্রুতির হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে দু'জনে দু'জনের দিকে।

মেয়েটির ছলছলে চোখ নজর এড়ায়নি মোহরের।

পরে বঙ্কিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে মেয়েটির মামার বাড়ি ওদের পাড়াতেই, সান্যাল জ্যেঠু ওর বড় মামা। বোধহয় গরমের ছুটিতে ঘুরতে এসেছে। ওরা ঐ সুন্দরী মেয়েটিকে নন্দিনী বলেই সম্বোধন করতো, আসল নাম জানার চেষ্টাও কেউ করেনি, অথবা বললেও গুরুত্ব পায়নি। মেয়েটি রোজ ওদের ক্লাসের সময় মাঠের কোণে দাঁড়িয়ে থাকতো, অবশ্যই অপলক তাকিয়ে থাকতো রজতকাকুর দিকে। রজতকাকুও শেখানোর ফাঁকে ফাঁকে আড় চোখে

দেখে নিতে ভুলতো না। প্রেম প্রেম গন্ধ পেয়ে মোহরদেরও যথেষ্ট ইন্টারেস্ট জন্মেছিল। চুপচাপ গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে যেতো ওরা বান্ধবীরা।

কয়েকদিন পরেই পাড়ায় হৈ হৈ পড়ে গিয়েছিল, নন্দিনীকে নিয়ে নাকি রজতকাকু কোথায় পালিয়ে গেছে। সান্যাল জ্যেঠু পুলিশ লাগিয়েছিল, কিন্তু খুঁজে পায়নি। তারপর তো মোহরদের ক্লাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কবি সুকান্ত ক্লাবে একটা গানের স্কুল খুলেছিল কিন্তু জিমনাস্টিক আর শুরু হয়নি।

মাস খানেক পর রজতকাকুকে আবার রাস্তায় দেখে মনে হয়েছিল, আবার বুঝি কাকুর কাছে ক্লাসে যাবে। কিন্তু ততদিনে পাড়ার লোকেরা রজতকাকুকে বয়কট করেছিল। কারোর মেয়েকেই নাকি আর ভরসা করে ওর কাছে পাঠানো যাবে না। মোহরের বাবা তারপর বালিগঞ্জে ফ্ল্যাট কিনে চলে এলে পুরোনো পাড়ার সাথে সমস্ত সম্পর্কই ছিন্ন হয়ে যায় মোহরের। তবে আসার আগে পর্যন্ত রজতকাকুকে যতবারই দেখেছে ততবারই খেয়াল করেছে একটা বিষণ্ণতার চাদরে মুখটা ঢাকা। সকাল হলেই আর রাস্তায় জগিং করতে দেখতে পায়নি মোহর। শুধু অফিস টাইমে একটা ব্যাগ বগলে রজতকাকুকে অন্যমনস্ক ভাবে হেঁটে যেতে দেখেছিল।

মা ডাকল ডিনার টেবিল থেকে, অগত্যা হঠাৎ খুঁজে পাওয়া স্মৃতির ঘরে আপাতত তালা ঝুলিয়ে রেখে যেতেই হলো ডাইনিং টেবিলে।

বাবা-মা দু'জনেই মেয়ের প্রথম দিনের স্কুলের এক্সপিরিয়্যান্স শুনতে উৎসাহী, কিন্তু কেন জানে না মোহরের উৎসাহ নেই। হঠাৎ এলোমেলো কথার ভিড়ে মোহর বাবাকে জিজ্ঞেস করল, বাবা তোমার রজতকাকুকে মনে আছে?

বাবা কিছু বলার আগেই মা বলল, কেন তোর সাথে দেখা হলো বুঝি? বেশি কথা বলতে যাস না, কিছু কিছু মানুষের তো আবার বয়স হলেও চরিত্র ঠিক হয় না!

বাবা বিরক্তির সুরে বলল, রজতকে কিন্তু আমি কোনো দিনই খারাপ

কিছু করতে দেখিনি।

মা স্বভাব সিদ্ধ ঢঙে বলল, গোটা পাড়া জানতো সান্যালদের ভাগ্নীটাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে খারাপ কাজ করতে গিয়েছিল, কেন তুমি জানতে না? রজত তো দু'দিন জেলও খেটেছিল!

এবার আশ্চর্য হবার পালা মোহরের, কাকু জেল খেটেছিল!

বাবা বলল, জেল লোক বিনা কারণেও খাটে। মিথ্যে দোষারোপ যে নয় কে বলতে পারে?

মোহর আর বাক-বিতণ্ডার মধ্যে না গিয়ে চুপচাপ খেয়ে উঠে গেল। যতক্ষণ না ঘুম এল ততক্ষণ শুধু রজতকাকুর প্রেমিকা নন্দিনীর মুখটাই মনে পড়ে যাচ্ছিল ওর। সত্যিই কি কাকু রেপ করতে গিয়েছিল? মোহর তো তখন এইটে পড়ে, খারাপ পুরুষের চোখের ভাষা বা ছোঁয়া বোঝার বয়েস তো হয়েছিল ওর, কই রজতকাকুকে তো কোনোদিন অমন মনে হয়নি। বরং যখন মাথায় হাত বুলিয়ে দিত মনে হতো বাবার মতোই স্পর্শটা।

পরের দিন স্কুলে গিয়ে থেকে মোহর শুধু একটু ফাঁক খুঁজছিল। বারবার চোখ চলে যাচ্ছে গলার ঐ আকর্ষণীয় তিলটার দিকে।

কেকাদি একটা কথা বলবো?

মোহরের দিকে মিষ্টি হেসে কেকাদি বললেন, বলো...

বাঁদিকের গজ দাঁতটা দেখতে পেয়ে আরো স্যাঙ্গুইন হলো ও।

আপনি রজত অধিকারী বলে কাউকে চিনতেন? জিমনাস্টিক শেখাত...

মোহরকে কথা শেষ করতে না দিয়েই কেকাদি উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, কেন রজতের কী হয়েছে? কোনো অ্যাক্সিডেন্ট?

মোহর সামলে নিয়ে বলল, না না সেরকম কিছু নয়। আপনার ফুলবাগানের রায়পাড়া, সান্যাল বাড়ি মনে আছে?

এতক্ষনে ঢোক গিলে কেকাদি বললেন, তুমি কে? আমাকে কী করে চিনলে?

মোহর আশ্বস্ত করার ঢঙে বলল, সেরকম কিছু নয়। আসলে আমি রজত

কাকুর কাছে জিমনাস্টিক শিখতাম, তখন আপনি হয়তো কলেজে পড়েন, রায় পাড়ায় আপনাকে দেখেছি বহুবার।

কেকাদি হঠাৎ মোহরের হাত ধরে বললেন, তাহলে তো তুমি ওখানেই থাকো, আমাকে বলতে পারো রজতদা কেমন আছে? বিয়ে করেছে? ওর বৌ কেমন দেখতে? কটা বাচ্চা? এখনো জিমনাস্টিক করে? বয়েস হলো তো আর বোধহয় পারে না।

এতগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে বুঝতেই পারেনি মোহর। আসলে ওর নিজের একটা কৌতূহল মেটাতে গিয়ে যে এরকম একটা পরিস্থিতির শিকার হবে কল্পনার বাইরে ছিল ওর। মোহর ভেবেছিল রজতকাকুর মতো একজন রেপিস্টের কথা শুনে হয়তো ঘৃণায় মুখ বাঁকাবে কেকাদি। কিন্তু এখন দেখছে কেকাদির চোখে জল! কোনও চরিত্রহীনের জন্য কোনও মহিলা এত বছর পর কাঁদতে পারে বলে তো মোহর শোনেনি কখনো।

স্কুল ছুটির পর কেকাদি আর মোহর সামনাসামনি বসে আছে একটা কফি শপে।

বলতে শুরু করেছেন কেকাদি, ভিজে গলা চোখও ভিজে... ধুলো ঝাড়াতে বসেছে তেরো বছর আগেকার কোনও এক সন্ধ্যার হঠাৎ পাওয়া মুহূর্তের।

ভালোবাসতাম আমরা দু'জন. দু'জনকে। রজতদা বলেছিল, আমার পড়াশোনা কমপ্লিট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আর নিজেও আর একটু ভালো চাকরির চেষ্টা করবে। কথা দিয়েছিলাম, কোনোদিন কোনো পরিস্থিতিতেই হাত ছাড়বো না কেউ কারোর।

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা কেউ কোথাও পালাইনি। শুধু বড় মামা দেখে ফেলেছিল আমাদের একসাথে। হ্যাঁ সেদিন আমরা একটু ঘনিষ্ঠ ভাবেই দাঁড়িয়েছিলাম বাগানের অন্ধকারে। মামা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল ঘরের ভিতর। শুনেছিলাম রজতকে পুলিসে দিয়েছে মামা। মামা আর বাবার প্রচুর প্রতিপত্তির সাথে রজত পেরে উঠবে না জানতাম। তাই বাবার কাছে লিখে দিয়েছিলাম, রজতকে জেল থেকে ছাড়িয়ে দিলেই আমি ওকে

ভুলে যাবো। তারপর তো আর কখনো মামার বাড়ি আসতে দেয়নি বাবা। রজতের ফোনে ফোন করেছিলাম একবার, সেটাও বাবা ধরে ফেলেছিল। আমার জন্য ছেলেটার জীবন নরক হয়ে গিয়েছিল।

মোহরের মনে হচ্ছে চোখের সামনে কোনো সিনেমা দেখছে। সান্যাল জ্যেঠুর মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। ঠিক হিন্দি সিনেমার ভিলেনের মতো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যেন ওর মুখের রেখাগুলো।

কেকাদি বলল, ভাগ্যের কি পরিহাস। এক বছরের মধ্যেই বিয়ে দিয়ে দিল আমার, আর দু'বছরের মধ্যেই বিধবা হলাম। ফিরে এলাম বাবা'র বাড়ি। আবার পড়াশুনা করতে শুরু করলাম, পরীক্ষা দিয়ে পেয়ে গেলাম এই চাকরিটা।

মোহর বলল, তারপর আর কখনো খোঁজ করেননি রজতকাকুর?

কেকাদি মাথা নাড়ল। না, মামি বলেছিল রজত বিয়ে করেছে, তাই আর...

কেকাদির সাথে মোহরের এই মিষ্টি সম্পর্কটা স্কুলে অনেকেরই একটু ঈর্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা ঠিক কি নিয়ে কথা বলে সেটাই সকলের জানার আগ্রহ।

কখনো কেকাদি বলে, মোহর তোমার মনে আছে আমি মাঠের কোণের দিকে দাঁড়িয়ে থাকতাম আর রজতদা আড় চোখে তাকাতো। মোহর হেসে বলে, আমাদের গোয়েন্দাগিরির চোটে তোমাদের প্রেম তখন ধরা পড়ে গেছে। আশ্চর্য ভাবে একজন চল্লিশের মহিলা অবলীলায় পৌঁছে যায় সেই উচ্ছল তারুণ্যে।

পুরোনো ডায়রি ঘেঁটে মোহর সেদিন বহ্নিদের ফোন নাম্বারটায় রিং করল। যদিও এখন আর সেই নাম্বার আছে কিনা তাও জানা নেই মোহরের। যা ভেবেছিল তাই, নাম্বারটা বন্ধ হয়ে গেছে। ফেসবুকে বহ্নিশিখা বসু সার্চ করতেই পেয়ে গেল রায়পাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের বহ্নিকে। মেসেজ নয় ডিরেক্ট ম্যাসেঞ্জারে কল করল ও। বার চারেক পর বহ্নির গলা।

মোহর শুনে আনন্দে আত্মহারা বহ্নিকে ও প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, এই

তোর রজতকাকুর কী খবর রে?

বঙ্কি বলল, তিনদিন আগেও দেখেছি বাজার করে ফিরছে। তবে বয়সের তুলনায় বুড়িয়েছে বেশি।

আর বিয়ে থা?

বঙ্কির গলায় আক্ষেপের সুর! বিয়ে তো করল না রে। বরঞ্চ বছর তিনেক আগে মা হারা হয়ে একাই থাকে এখন।

মোহর শুধু জেনে নিল ওই বাড়িতেই আছে কিনা।

দরজার বাইরে সেই মাধবীলতার ঝোপটা আর নেই। মোহররা তখন কত মাধবীলতার ঝাড় তুলে খেলা করেছে। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় বাড়িটাকে দেখে মনে হচ্ছে বড্ড ক্লান্ত, শীর্ণ। এই বাড়ির মালিক বোধহয় শুধুই দুঃসংবাদ আশা করে, কোনো সুসংবাদ-এর খবর ওর কল্পনার অতীত।

বেলটা দু'বার বাজতে দরজা খুলল রজতকাকু। না, ট্র্যাকসুট আর স্লিভলেস গেঞ্জি পরে নেই। একটা সাদাটে জামা আর পায়জামা পরে বেরিয়ে এল।

মোহরকে চিনতে পারেনি বোঝাই যাচ্ছে। চেনার কথাও নয়, ক্লাস এইটে ফ্রক পরা মোহরের সাথে আজকের শান্তিনিকেতনি সুতোর শাড়ি পরা মোহরের অনেক পার্থক্য। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে কাকু। মোহর ভণিতা না করে বলল, মন্মথ রায়ের মেয়ে মোহর। এবার চিনতে পেরেছ?

একমুখ হেসে কাকু বলল, ওমা এত বড় কী করে হলি?

মোহরের হাসি পেয়ে গেল কাকুর কথায়। ও বলল, যেমন করে তুমি এত বুড়ো হলে!

হ্যাঁরে, মন্মথদা ভালো আছেন তো? আর বৌদি? সবাই ভালো আছে শুনে বলল, বল এতবছর পর কী মনে করে?

মানুষটার দিকে তাকিয়ে মোহরের প্রথমেই যে কথাটা মনে হলো, পাড়ার এত লোকের মিথ্যাচারণের বিরুদ্ধে কোনোদিন কেন রুখে দাঁড়ায়নি কাকু! কেকাদির অসম্মানের ভয়ে নয় তো!

কাকু আজ তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব আমি।

ভ্রু কুঁচকে বলল, কি রে তোর বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে এলি নাকি?

মোহর বাড়ির বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে কাকু বলল, কি রে না বলেই কোথায় যাচ্ছিস?

কেকাদি তখন বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে। মোহরকে দেখতে পেয়েই বলল, ভালো আছে রজতদা?

মোহর বলল, ভালোই।

কেকাদি কাঁপা গলায় বলল, তাহলে চলো ফিরে যাই, আর দেখা নাই বা করলাম! আশ্চর্য চোখে তাকিয়ে মোহর কেকাদির হাতটা ধরে টেনে নিয়ে চলল, কাকু তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

কেকাদিকে এক নজরেই বোধহয় চিনতে পেরেছে। নাকি মুখের আদল দেখে অনুমান করেছে সেটা কাকুই বলতে পারবে।

কেকাদি বলল, শরীরের কী হাল করেছো?

কাকুর চোখের পাতা থেকে সিগারেটে পোড়া ঠোঁটটা পর্যন্ত অভিমানে কেঁপে উঠল যেন।

ওরা ঘরে ঢুকে সোফায় বসেছে। ওদের বারণ না শুনেই মোহর বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। তেরোটা বছর তো খুব কম সময় নয়!

অনেক অনেক কথা জমে আছে ওদের, অনেক না বলা অনুভূতি, অভিমান, কষ্ট ভাগ করে নেবে আজ ওরা। এই মূল্যবান সময়টুকু মোহর কিছুতেই কেড়ে নিতে পারবে না ওদের কাছ থেকে। কল্পনা করছিল মোহর, হয়তো রজতকাকু বলবে, তোমার গলার তিলটা এখনো তোমাকে হাজারের ভিড়ে আলাদা করে। আর কেকাদি চল্লিশেও লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নেবে। ওদের আজ অফুরন্ত সময় চাই... নিভৃতে...

খেলনা বাড়ির মেয়ে

ওরে তোরা কেউ আমাকে হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দে। তোরাই আমার প্রকৃত বন্ধু রে। তোরা বলেছিলি ওই সুরভীর প্রেমে কিছুতেই না পড়তে! তবু আমার দু-দুটো বছর নষ্ট হলো, ঐ মেয়ের পাল্লায় পড়ে। এখন বলে কিনা তোমার যা কেরিয়ারের অবস্থা, তাতে চাকরি তুমি তো জোটাতেই পারবে না। তাই বিয়ের স্বপ্ন দেখাও পাপ।

হ্যাঁরে রাজীব, তুই কোন আক্কেলে সুরভীর সাথে প্রেম করতে শুরু করলি! তোরা না আমার কাছের বন্ধু?

আমি মনুমেন্টের ওপর থেকে লাফ দেব আর বাঁচতে চাই না। কী হবে সুরভী ছাড়া বেঁচে। রাজীব অপরাধীর মতো তাকিয়ে আছে, বন্ধু অর্কর দিকে। অর্কর দু'বছরের প্রেমিকা এখন ওকে ভালো বাসছে। যদিও সুরভীর সাথে রাজীবের এখনও সামনা-সামনি কথা হয়নি। তবে ও জয়েন্টে চান্স পাবার পরে নাকি সুরভী অর্কর কাছে বলেছে, রাজীব তোমার থেকে অনেক বেটার। তোমার থেকে তো রাজীবকে ভালোবাসা ভালো।

অর্ক বলল, আমি ভিক্টোরিয়ার পরীটার ওপর থেকে ঝাঁপ মেরে জীবন শেষ করতে চাই। অনেকক্ষণ ধরে ময়দানে বসে প্রতাপ শুনছিল প্রাণের বন্ধু অর্কর কথা। এতক্ষণ পরে মুখ খুলল প্রতাপ।

কষ্ট করে মনুমেন্টের মাথায় বা ভিক্টোরিয়ার পরী অব্দি পৌঁছানো ভীষণ চাপের, তার থেকে তুই এক কাজ কর অর্ক, তুই হাওড়া ব্রিজেই চল আমরা জনা তিনেক গিয়ে তোকে ঠেলে দিয়ে আসি।

অর্ক মিইয়ে পড়া মুখে বলল, লজ্জা করে না, আগের বার ক্রিসমাসেও তো আমার জন্মদিনে পাওয়া টাকায় পার্কস্ট্রিটে ফূর্তি মারলি তোরা। এখন আমার প্রাণ নিতে চাইছিস? আমি মরলে তোদের তিনটেকে মেরে মরবো। আসলে গতকাল জয়েন্টের রেজাল্ট বেরিয়েছে। প্রতাপ, রাজীব, অনিরুদ্ধ আর অর্ক চারজন বন্ধুর মধ্যে একজনই একেবারে শেষের দিকে র‍্যাঙ্ক করেছে সেটা হলো ওদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় অর্ক। উচ্চমাধ্যমিকে দুর্দান্ত রেজাল্ট হলেও জয়েন্টে ধেরিয়েছে ও। তাছাড়া ওর একই ক্লাসে পড়া প্রেমিকা বলেছে, এত বাজে রেজাল্টের কাউকে নাকি ওর পাশে মানায় না।

অর্কর এন্ডোক্রিনোলজিস্ট বাবাও বলেছে, আদৌ কি অর্ক তার ছেলে?

প্রশ্নটা যেহেতু মায়ের দিকে তাকিয়ে করা হয়েছিল, তাই অর্কর ফিজিক্সের প্রফেসর মা তেড়েফুঁড়ে বলেছিল, এখন তো আমার পুরো বিশ্বাস হলো ও তোমারই ছেলে। কারণ ফার্স্ট বার জয়েন্টে তুমি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে চান্স পাওনি। তোমাকেও আরেকবার বসতে হয়েছিল জয়েন্টে!

বাবা ধপধপ করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মা বোধহয় আজ কলেজে যাবে না।

সকলে জানতে চাইবে অর্ক জয়েন্টে কত র‍্যাঙ্ক করেছে, আর মা লজ্জায় কিছুই বলতে পারবে না কলিগদের, তাই আজ আর বেরোবে না মা।

এরপরও কি অর্কর বেঁচে থাকার অধিকার আছে?

অনিরুদ্ধ একটু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিতে পছন্দ করে। ও বলল, দেখ অর্ক, আমার মনে হয় তুই ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি নিয়ে কোনো একটা কলেজে ভর্তি হয়ে থাক। তারপর না হয় পরের বছর ফুল প্রিপারেসন নিয়ে জয়েন্টে বসবি।

ওদের পাশ দিয়ে একটা নিম্ন বর্ণের আদিবাসী মেয়ে কাগজ কুড়াতে কুড়াতে যাচ্ছিল।

অর্ক তখন মরে যাবো... বাঁচতে চাই না বলে কেঁদে চলেছে।

মেয়েটির বয়স বছর বারো কি তেরো। গায়ের রং বেশ বার্নিশ করা কালো,

অপুষ্ট শরীর, জট পাকানো চুল... শুধু এক জোড়া ঝকঝকে চোখ। চোখ দুটো এখনও এই নোংরা পৃথিবীর কালিমা মুক্ত।

মেয়েটি পায়ে পায়ে অর্কর কাছে চলে এসেছে। নিজের হাতে আধ খাওয়া পাউরুটিটা দিয়ে মেয়েটি বলল, কাঁদিস না খিদের বড় জ্বালা, আমিও বুঝি রে।

এই নে, এটা খেয়ে নিয়ে অনেকটা জল খেয়ে নে।

মেয়েটা চলে গেল, অর্কর হাতে ওর পাউরুটির টুকরো।

অর্কর কান্নার একটাই মানে বেঝে মেয়েটি, সেটা খিদের জ্বালা।

অদ্ভুত ব্যপার তো! নিজের খাদ্য নেই, তবুও ও এসেছে আরেকজন ক্ষুধার্ত মানুষের উপকার করতে? অর্ককে ও ক্ষুধার্তই ভেবেছে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের জল মুছে নিয়ে এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে পড়ল অর্ক। বলল, জয়েন্ট-সায়েন্স ক্যানসেল... আমি লিটাচের নিয়ে পড়বো।

রাজীব, প্রতাপদের মুখ হাঁ হয়ে গেছে। এর থেকে যদি অর্ক মনুমেন্টের মাথা থেকে লাফ দিতো তাহলেও হয়তো ওরা এতটা অবাক হতো না। যোধপুর বয়েজের ফার্স্ট বয় শেষ পর্যন্ত সিটি কলেজে বাংলা নিয়ে ভর্তি হলো।

অর্কর বাবা শুভেন্দু মিত্র আর মা পামেলা মিত্র দু'জনেই আপাতত অর্কর সাথে মৌনব্রত পালন করছেন। তাদের একমাত্র সন্তান তাদের ইচ্ছায় জল ঢেলে দিয়ে, পরিবারের মান-সম্মান সব ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত লোককে বলতে হচ্ছে, অর্ক মিত্র বাংলা নিয়ে পড়ছে! মা বলল এই দেখার আগে নাকি মৃত্যু শ্রেয় ছিল। বাবা বোধহয় সামনের মাসেই নিজের কাউন্সিলিঙের জন্য সুজন সেনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রেখেছেন। বাবা নাকি দিনকে দিন ডিপ্রেশনের পেশেন্ট হয়ে যাচ্ছেন, তার কারণও নিজের সন্তান অর্ক।

সুরভী বন্ধুদের কাছে হেসে বলছে, আমি জানতাম অর্ক এমন একটা

কিছু করবে। তাই আমি ওকে সরিয়ে দিয়েছি আমার লাইফ থেকে।

অনিরুদ্ধ, প্রতাপ আর রাজীবই সঙ্গে আছে। বাংলা নিয়ে পড়ে ও ডঃ সুকুমার সেন বা শংকরী প্রসাদ বসু হবে, এমন আশা অবশ্য ওরা জাগায়নি। শুধু লঝঝড়ে ভবিষ্যতের একটা ছেলেকে বন্ধু হিসাবে ওরা মেনে নিয়েছে আর কি।

একমাত্র রাজীব ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ভর্তি হয়েছে, বাকিরা মেডিক্যাল-এ। সুরভীও পড়ছে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে।

অর্ক প্রায় সন্ধ্যার দিকে গিয়ে বসে থাকে ময়দান চত্বরে। সেই আদিবাসী মেয়েটার নাম ঝুমুর। ওর সাথে এখন অর্কর বেশ পরিচয় হয়ে গেছে। প্লাসটিকের বোতল আর কাগজ কুড়ানোর ফাঁকে সে অর্কর সাথে গল্পও করে। একদিন অর্ক গিয়েও ছিল ঝুমুরের ঝুপড়িতে। বারো বছরের মেয়েকে একদিন অর্ক একটা বড়সড় চকলেট দিয়েছিল, ঝুমুর চকলেট পেয়ে প্রথমেই আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল কিন্তু পরক্ষণেই ওর চোখে নেমে এসেছিল দুঃখের ছায়া।

মেয়েটা অর্ককে বলেছিল, এই লজেনের কত দাম রে?

একশো ত্রিশ টাকা শুনে চকলেটটা অর্কর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ঝুমুর বলেছিল, তুই বরং এটা দোকানে ফেরত দিয়ে একটু দুধ কিনে দে। তাহলে আমার দু'বছরের ভাইটা আর খিদের জ্বালায় কাঁদবে না।

অর্ক বলেছিল, তোর তো কোন ভাই বোন নেই রে?

ঝুমুর একমুখ হেসে বলল, আমার মায়ের পেটের ভাই নয়, কিন্তু ওই যে আমাদের পাশের ঘরের আমীন জেঠুর ছেলেটা, ওই তো আমার ভাই। দিন রাত খিদের জ্বালায় কাঁদে রে।

অর্কর দু'চোখে জল এসে গিয়েছিল। নিজেদের লাঞ্চ আর ডিনার টেবিলে প্রতিদিনের অপচয়ের হিসেবটা মনে পড়ে গিয়েছিল নিমেষে।

দু'দিন অর্ক ময়দানে না এলেই ঝুমুর অভিমানী গলায় বলে, কী রে আসিসনি কেন? আমি টাকা চাইব বলে!

অর্কর ওকে টুকিটাকি জিনিস দেওয়া থেকে ঝুমুরের ধারণা হয়েছে অর্ক

রাজা লোক।

যদিও অর্কর আর্থিক অবস্থা সত্যিই ঈর্ষণীয় কিন্তু ওর নিজস্ব কিছু নেই এখনো। সব সম্পর্কের একটা টান থাকে। বিশেষ করে যদি সেটা নিঃস্বার্থ হয়। ঝুমুরের পকেটভর্তি কাঁচা আম। বোশেখ মাসের ঝড়ে পড়া আম ও কুড়িয়ে এনেছে অর্কর জন্য। কৃতজ্ঞতা বলেও তো একটা কথা আছে। অর্ক প্রায়ই কিছু না কিছু দেয় ওকে, বিনিময়ে এটুকু না দিলে কী করে চলে! অর্ক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বার্নিশ কালো ঝুমুরের দিকে। একটা অশিক্ষিত, হত দরিদ্র, কৃতজ্ঞতা না বোঝা মেয়েও অদ্ভুত ভাবে ফিরিয়ে দিতে জানে! ঋণ শোধের কী আপ্রাণ চেষ্টা!

গ্র্যাজুয়েশনে ফার্স্টক্লাস পেয়েও অর্ক কাউকেই খুশি করতে পারল না। খুশি করার ইচ্ছেটাও ওর আর নেই। কতগুলো নম্বরের সমষ্টি যে জীবন নয়, সেটা অর্ক এখন বুঝেছে। জীবনকে ভীষণ কাছ থেকে দেখে বুঝেছে।

ঝুমুরের সূত্রে ওদের গোষ্ঠীর অনেকের সাথেই পরিচিত হয়েছে অর্ক মিত্র। মাঝে মাঝেই অর্ক ওদের ত্রিপলের নিচের ছোট্ট খেলনা বাড়িতে গিয়ে সময় কাটায়।

অর্ক এগুলির নতুন নাম দিয়েছে খেলনা বাড়ি। খুব ঝড়ে বা অতিবৃষ্টিতে ভেঙে যায় এদের আস্তানা। তবুও এরা বাঁচে। ভেঙে যাওয়া জিনিস দিয়ে নতুন করে তৈরি করে আরেকটা খেলনা বাড়ি। ওরাও মিশে গেছে অর্কর সাথে। ওরা জানেই না অর্কর স্ট্যাটাস আর ওদের জীবনযাত্রায় ঠিক কতটা অমিল! অর্ক কখনও বুঝতেই দেয়নি যে ও ওদের থেকে আলাদা। তবে অর্ককে নিয়ে ঝুমুরের একটা আলাদা গর্ব আছে, যেহেতু ঝুমুরের সাথেই অর্কর বেশি ভাব তাই।

মাস্টার্সে ভর্তির পর থেকে একদিনও ঠিক মতো ইউনিভার্সিটি যায়নি অর্ক। যায়নি বললে ভুল বলা হবে, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের ঝাঁকড়া কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে বসে ও এক মনে কী যেন করে। ক্লাস মিস করে রোজই।

স্বাভাবিক ভাবেই মাস্টার্সের ফার্স্টটার্মের রেজাল্ট উল্লেখযোগ্য হল না ওর।

যদিও অর্কর বাবা-মা আর অর্কর ওপর কোন ভরসা রাখেননি। স্পয়েল্ড বয় বলেই ধরে নিয়েছেন ওকে।

* * * * * *

প্রথমেই সমালোচনাটা চোখে পড়ল সুরভীর। বরাবরই ওর একটু বই পড়ার নেশা। 'বইয়ের দেশ' ঘেঁটে বইয়ের লিস্ট বানাতে বানাতেই চোখে পড়ল 'অর্ক মিত্র'র নাম। 'খেলনা বাড়ির মেয়ে' উপন্যাসের রাইটার অর্ক মিত্র। নাম আর সারনেম এভাবেই মিলেও তো যায় কখনো কখনো। রাজীবকে ফোন করে জানতে পারল, ওর প্রাক্তনই এই পুরস্কার প্রাপ্ত বইয়ের লেখক।

অর্ক! আনন্দ পুরস্কার পাচ্ছে! ভাবতেই রক্তে শিহরণ খেলে গেল সুরভীর।

বই মেলার আগেই ওর দু'হাজার কপি বই শেষ হয়ে গেছে। সাহিত্যিকদের সমালোচনা বয়ে যাচ্ছে, বেস্ট সেলার হতে যাচ্ছে 'খেলনা বাড়ির মেয়ে'।

বইটির রিভিউতে লেখা আছে, ঝুমুর বলে একটি মেয়ের জীবন কাহিনী। রাতের অন্ধকারে পাশের বস্তির সাত বছরের রিঙ্কুর ইজ্জত নিতে আসা তিনটে ছেলেকে একা জখম করেছে এই ঝুমুর। কাগজ কুড়ানি ঝুমুরের লোকের ওয়ালেট ফেরত দেবার বর্ণনা আছে 'খেলনা বাড়ির মেয়ে' উপন্যাসে। ঝুমুরের যে আসল মা সে নাকি মারা গিয়েছিল ঝুমুর যখন মাত্র তিন দিনের। সেদিন থেকেই ঝুমুর বড় হয়েছিল একজন বৃহন্নলার কাছে। তারপর ঝুমুরের সেই পালিতা মাও অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। এরপর ঝুমুরের অভিভাবক ঝুমুর নিজেই। এতটাই নিখুঁত বর্ণনা আছে ওই বস্তির, যে পাঠকের মনে হচ্ছে তারাও ওদের সাথেই এদের পরব পালন করছে।

অর্কর বাবা আজ চেম্বার বন্ধ রেখেছেন। মা কলিগদের বলে দিয়েছেন যে তিনি আজ কলেজে আসতে পারবেন না। ছেলে আনন্দ পুরস্কার নিতে যাচ্ছে আর মা কলেজে বসে থাকবে, তা হতে পারে না।

সকালে অর্ক নিজের পড়ার ঘরে বসেছিল। লেখালিখি করছিল মন দিয়ে। হঠাৎ খুব পরিচিত গলায় কেউ ডাকল, অর্ক...!

চোখ তুলে তাকাতেই দেখল, এক মুখ হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুরভী। ওর হাতে অর্কর লেখা 'খেলনা বাড়ির মেয়ে' উপন্যাসের দুটো কপি।

খুব ক্যাজুয়াল ভাবে সুরভী বলল, একটা আমি আমার কাছে রাখবো আর অন্য কপিটা বন্ধু, পরিচিতদের পড়তে দেব। তোমার বই বলে কথা, সকলকে জানাতে হবে না?

অর্ক একটু ক্লান্ত ভাবে হাসল। চোখের সামনে দু'বার মানুষের রং-রূপ সব পালটাতে দেখল ও। মাত্র চার বছরের ব্যবধানে আবার পরিবর্তিত হলো মানুষগুলো। নিজের বাবা-মা, আত্মীয় এবং সুরভী।

না রাজীব, অনিরুদ্ধ আর প্রতাপের তেমন পরিবর্তন নেই। জয়েন্টে চান্স পায়নি বলে সেদিন দুঃখ করেছিল ওর সাথেই, আজ অর্ক খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বলে আনন্দে নাচছে ওরা। এত কম বয়সের কোনো সাহিত্যিকের প্রথম বই পুরস্কৃত হচ্ছে এই প্রথম। এটাও অবশ্য আলোচনার বিষয়।

সুরভী আহ্লাদী গলায় বলল, পয়লা বৈশাখ যেদিন আনন্দ পুরস্কারের ঘোষণা হলো আর তোমার নাম দেখলাম, সেদিনই ঠিক করেছি গ্র্যান্ড হোটেলে আমিও তোমার সাথে পুরস্কার আনতে যাবো।

অর্কর সাথে পুরস্কার আনতে যাওয়ার লিস্টে আর একটা নাম সংযোজিত হলো... সুরভী দত্ত।

বৈশাখের একুশ তারিখে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে গ্র্যান্ড হোটেলে। বিখ্যাত সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আনন্দ পুরস্কার তুলে দেবেন অর্কর হাতে।

বাইরে গাড়ি নিয়ে বাবা-মা রেডি। অর্কর জন্য অপেক্ষা করছে সকলেই। সুরভীও এসে উপস্থিত অর্কর বাড়িতে।

অর্ক বাইরে এসে বলল, তোমরা এগোও আমি আসছি। স্যুট না পরে অর্ক পাঞ্জাবি পরেছে দেখে মা বিরক্ত। কিন্তু আজ আর কিছু না বলেই গাড়ি স্টার্ট করলেন অর্কর বাবা ডক্টর শুভেন্দু মিত্র।

ভায়াসে অর্কর ছোট্ট বক্তৃতার ফাঁকেই অর্ক সুরভীর বদলে ডেকে নিয়েছে ওর গল্পের নায়িকা ঝুমুরকে।

ঝুমুরকে আজ বড় পবিত্র লাগছে। একটা সাদা চুড়িদার পরেছে ও। চোখে কোনো জড়তা নেই, শুধু এত বড় জায়গায় এসে একটু ভয় করছে। তবে দাদা যেখানে আছে সেখানে ওর ভয় কীসের?

অর্কর হাতটা চেপে ধরে আছে 'খেলনা বাড়ির মেয়ে'-র নায়িকা। পুরস্কার অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিকদের ভিড়ে ঝুমুর হকচকিয়ে গেছে। তারপর আবার কোনো এক সিনেমা পরিচালক নাকি মুভি করতে চান খেলনা বাড়ির মেয়ের গল্প নিয়ে। আর সেখানে নায়িকার ভূমিকায় ওরা ঝুমুরকেই চাইছেন। আজই সাইন করাতে চাইছেন পরিচালক।

অর্কর হাতটা টেনে ঝুমুর বলল, এই দাদা ভয় করছে রে! অর্ক ওর মাথায় আলতো করে হাত রেখে বলল, ঝুমুর তোর আর তোর দাদার পথ চলা এই সবে শুরু।

সুরভী বুঝে গেছে এই অর্ক আর তার প্রাক্তনের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সুরভী আর চেষ্টা করেও ছুঁতে পারবে না নবীন সাহিত্যিক অর্ক মিত্রকে। অর্কর কলম এখন তলোয়ারের মতোই বিদ্ধ করবে আপামর পাঠক শ্রেণীকে।

অনিরুদ্ধ আস্তে আস্তে বলল, চল অর্ক আজ মনুমেন্টের মাথা থেকে ঝাঁপ দিবি?

অর্ক হেসে উত্তর দিলো, অবশ্যই ঝাঁপ দেবো। তবে মনুমেন্টের মাথা থেকে নয়, ওর নীচে বসে থাকা ভিখারীদের মধ্যে আর কোনো ঝুমুর আছে কি না খোঁজার জন্য ঝাঁপ তো দিতেই হবে।

প্রসব বেদনা

মৃন্ময়ী যেদিন এই বিশাল জমিদার বাড়িতে বউ হয়ে ঢুকেছিল, সেদিন বড় বড় ঘরের ছাদ পর্যন্ত দেখতে দেখতে তার ঘাড়ে যন্ত্রণা করছিল। চোদ্দর মৃন্ময়ীকে সবাই জমিদার গিন্নি বলে সম্বোধন করছিল। ভিতরে ভিতরে একটু ঘাবড়ে গেলেও সামনে ভয় প্রকাশের মেয়ে মৃন্ময়ী কোনওকালেই ছিল না। দীনবন্ধুবাবুর ছোট মেয়ে মৃন্ময়ী যে কথার পিঠে কথা সাজিয়ে ঘায়েল করতে পারে প্রতিপক্ষকে, তা নিশ্চিন্তপুরের কারোরই অজানা নয়।

দীনবন্ধুবাবুর ওই ছোটমেয়েটির জন্য চন্ডীমন্ডপে বিচার সভাও বসেছে বহুবার। গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তির সামনে ওই একরত্তি মেয়ে কোমরে হাত দিয়ে বলেছে, অন্যায়টা সে কী করেছে? বিষ্ণু জ্যাঠার বাগানে এক বাগান আম পেকে পেকে পচে যাচ্ছে দেখেই সে ওই লক্ষ্মী ঠাকুমাকে খান দশেক পেরে দিয়েছে। ঠাকুমার কিনে খাওয়ার সাধ্য নেই বলে কি খেতে সাধ জাগে না বুঝি?

তার অকাট্য যুক্তির সামনে গ্রামের প্রধান হার মেনেছে। সেই মৃন্ময়ীর যে এমন রাতারাতি গুপ্তিপাড়ার জমিদার বাড়িতে বিয়ে হয়ে যাবে, এ বোধহয় নিশ্চিন্তপুর গ্রামের জনপ্রাণীও ভাবেনি।

জমিদারি প্রথা উঠে গেছে বহু বছর হলো। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে গুপ্তিপাড়াতেও। গ্রাম পঞ্চায়েতও আছে। এই পঞ্চায়েতেও প্রধান আছেন। তবু গুপ্তিপাড়ার রামনারায়ণের এই বিশাল বাগানওয়ালা বাড়িটাকে লোকে

জমিদার বাড়ি বলেই সম্মান করে আজও। গ্রামের গরীব, দুঃখী মানুষেরা বিপদে পড়লে আজও এই জমিদার বাড়িতে এসেই সুরাহা চায়। এই বাড়িতে নিত্যদিন প্রায় পঞ্চাশ থেকে সত্তর জনের পাত পড়ত এক সময়। সেসব দিন অতীত হলেও তিন মহলা বড়িটা আজও জমিদার বাড়ির গর্ব নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আজও গুপ্তিপাড়ার মানুষ রামনারায়ণবাবুকে দেখলে দু'হাত তুলে প্রণাম করে।

রামনারায়ণবাবুর দুই ছেলে। বিজয়নারায়ণ আর জয়নারায়ণ।

বিজয়নারায়ণের বিয়ে হয়েছে আজ বছর ছয়-সাত হলো। দু দুটো কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েই বিজয়ের স্ত্রী জমিদার বাড়ির সকলের আশায় জল ঢেলে দিয়েছে। আপাতত সব আশা ভরসার কেন্দ্রস্থল জয়নারায়ণের স্ত্রী মৃন্ময়ী।

যদিও মৃন্ময়ীকে এ বাড়ির কেউই ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না। বছর ষোলর মৃন্ময়ী যেন কেমন এলোমেলো। প্রায় দু বছর বিয়ে হয়েছে তার, তবুও যেন সংসার সম্পর্কে বড্ড উদাসীন সে, আর পাঁচটা বয়েসী বউ-র মতো তার স্বভাব নয়। রান্নাঘরে নুন-তেলের কৌটোর হিসেব রাখা তার চরিত্রে নেই। আনমোনা হয়ে ছাদের কার্নিশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জল মাখে, আকাশের সাথে কী সব কথা বলে।

রামনারায়ণের স্ত্রী পান্নাবালা রেগে গিয়ে বলেন, কপাল করে বউ এনে ছিলাম বটে ! একটা দুটো মেয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হলো। আরেকটার তো পোয়াতি হবার কোনো লক্ষণই নেই। সবই তাদের পাপের ফল। নাতির হাতের জল পেয়ে স্বর্গে যাওয়া তাদের কপালে আর নেই।

এদিকে জয়নারায়ণ এখনো পর্যন্ত কাউকে বলে উঠতেই পারেনি যে মৃন্ময়ীর সাথে তার এখনো কোনো শারীরিক সম্পর্কই তৈরি হয়নি। ফুলশয্যার ঘরেই মৃন্ময়ী কোমরে হাত দিয়ে চোখ পাকিয়ে বলেছিল, যেদিন আমি তোমাকে বন্ধু ভাববো সেদিনই আমার শরীরের অধিকার পাবে। আগে আমার মন জয় করে দেখাও।

Scanned by CamScanner

দু'বছর ধরে একই ঘরে থেকে, একই বিছানায় শুয়েও পঁচিশের জয়নারায়ণকে সন্ন্যাসীর মতোই জীবন কাটাতে হয়। পাশেই নিশ্চিন্তে ঘুমোয় লাল শাড়িপরা তার ফুটফুটে বউ মৃন্ময়ী।

এখনও শর্ত পূরণ করতে পারেনি জয়নারায়ণ।

মৃন্ময়ীকে এখনো বেশ কিছুটা শেখানোর বাকি আছে ইংরেজি সাহিত্যের। বাংলা সাহিত্য সে বাবার বাড়িতে দাদার কাছেই অনেকটা শিখে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ পড়ে ফেলেছে সে। রবিঠাকুরের সাথে নাকি তার মন দেওয়া নেওয়ার পালাও চুকেছে।

ইংরাজী জানা স্বামী জয়নারায়ণের কাছে তার একটাই দাবি, তাকে শেক্সপিয়র, শেলী, কীটস, বায়রন পড়াতেই হবে। A B C D আর ওয়ার্ড বুকের ইংরাজী জানা মানুষকে শেক্সপিয়র পড়াতে গিয়ে জয়নারায়ণ নিজেই সব ভুলতে বসেছে। তবুও পড়ার সময়টুকুই যা মৃন্ময়ী নিজের কাছে ঘেঁষতে দেয় ওকে। বাদবাকি সময় হয় জমিদার গিন্নির দায়িত্ব পালন, না হয় বই পড়া। জয়ের খুব ইচ্ছে করে ওই পুতুল পুতুল মেয়ের নরম ঠোঁটটাতে একবার ঠোঁট রাখতে, কিন্তু মৃন্ময়ী যা বেআক্কেলে! হয়তো চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে ফেলবে। নয়তো বাবার বৈঠকখানার ঘরে গিয়ে তার ছোট ছেলের অভব্যতা নিয়ে নালিশ ঠুকে আসবে মৃন্ময়ী। কোনওটাই তার কাছে খুব কঠিন নয়। অগত্যা মৃন্ময়ীর শর্তেই রাজি হতে হয়েছে ওকে।

মৃন্ময়ী বলেছে, যেদিন ওর ইংরাজি শেখা শেষ হবে সেদিনই নাকি জয়নারায়ণ মহেন্দ্রের মতো করে আশালতাকে আদর করতে পারবে।

কেন যে ইংরাজী শিখতে গিয়েছিল জয়!

জমিদার জয়নারায়ণের বাবার প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি এখন সরকারি স্কুলে পরিণত হয়েছে। সেই স্কুলের ইংরাজির শিক্ষক জয়নারায়ণের মনের দুঃখের হেতু কেউ বোঝে না। সকলেই মনে করে হয়তো সন্তান হচ্ছে না বলেই জয়ের এমন মন খারাপ।

যতই জমিদারী রক্ত ধমনিতে বহাল থাক, মৃন্ময়ীর তেজের কাছে তা কিছুই নয়।

একদিন মৃন্ময়ীকে একটু জোর করেই কাছে টানতে গিয়েছিল জয়।

মৃন্ময়ী আলগোছে বলল, মন বিহীন শরীর আর ছন্দ বিহীন কবিতা পড়ে যারা সুখ পায়, তুমিও কি তাদের দলেই পড়ো জয়নারায়ণ?

নিজের নামটি স্পষ্ট স্বরে স্ত্রীর মুখে শুনেই চমকে উঠেছিল জয়।

স্কুলের গন্ডী না পেরিয়েও এমন দার্শনিকদের মতো কথা তার ষোল বছরের বউ কোথা থেকে শিখল?

কবি গুরুর ওপর রাগটা ক্রমশ চেপে বসেছিল জয়ের। তবুও মৃন্ময়ী তার বিবাহিত স্ত্রী, এ বাড়ির ছোট বউ, এটা অস্বীকার করার ক্ষমতা নেই জয়নারায়ণের।

বয়স বাড়ছে রামনারায়ণের। আগের মতো পরিশ্রম করার ক্ষমতা কমছে।

হঠাৎই রামনারায়ণের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। পান্নাবালা বলতে লাগলেন এত বড় জমিদার বংশ রক্ষা করার মতো কাউকে রেখে যেতে পারলেন না তিনি, এ বড়ই দুর্ভাগ্যজনক। বিজয়ের স্ত্রী শিবানী নিজের দুই মেয়ে নিয়ে অপরাধীর মতোই বিশাল জমিদার বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। এমন কি বিজয়ের ধারণা তার বউ-র দোষেই তার পুত্র সন্তান হলো না। জমিদারের বীর্যের এত তেজ তবুও একটা ছেলে হয় না!

নিজেকে অপরাধী ভাবা বড় জাকে মৃন্ময়ী অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, কন্যা সন্তানকে সঠিক ভাবে মানুষ করতে হবে। তাদের বাপ ঠাকুর্দা তাদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে।

মৃন্ময়ীর মুখে হাত দিয়ে তার কথা বন্ধ করার চেষ্টা করেছে শিবানী।

মৃন্ময়ী বড় জা শিবানীকে 'শেষের কবিতা'-র বই থেকে শুনিয়েছে লাবণ্য চরিত্রের দৃঢ়তার কাহিনী। তবুও সে নিজেকে অপরাধী ভেবে

ঈশ্বরের কাছে পুত্র সন্তান কামনায় কাতর হয়েছে।

ইদানীং জয়নারায়ন খেয়াল করেছে, তার তেজী স্ত্রী একটু একটু লজ্জা পাচ্ছে। সেদিন যেমন, কবিতায় নারীর শরীর বর্ণনা করার সময় সে লজ্জা পেল।

তার সতেরোর স্ত্রী এখন বেশ ইংরাজি শিখেছে। মনযোগী ছাত্রী মৃন্ময়ী, অধ্যাবসায়ের জোরে সে ইংরাজী সাহিত্যের মতো কঠিন বস্তুও ধাতস্থ করে ফেলেছে।

সাহায্য ছাড়াই পড়তে পারছে বায়রন। কতটা বুঝছে সেটা অবশ্য জয় জানে না।

জয়নারায়ণও আর দেরি না করেই বলল, মৃন্ময়ী তুমি তো এখন সব শিখেছ, তাহলে তোমার শর্ত পূরণ করো, আমাকে স্বামীর অধিকার দাও।

মৃন্ময়ী নির্দ্ধিধায় বলেছিল, স্বামীর অধিকার তুমি সেদিনই পেয়েছ, যেদিন আমায় সিঁদুর পরিয়েছিলে। আজ তুমি আমার মনের অধিকারও নাও।

গত তিন বছর তুমি আমায় ভালোবেসে, আমার কথার মর্যদা দিয়ে আমার মন জয় করেছ, তোমাকে অদেয় কিছুই নেই।

উপন্যাসের ফুলশয্যার মতো মধ্যরাতে জুঁইয়ের গন্ধে বিভোর হয়ে দুটো শরীর-মন একাত্ম হয়েছিল।

জয়নারায়ণ বুঝেছিল তার স্ত্রী রত্নটি আর পাঁচজনের মতো ফেলনা নয়। একে খুব যত্নে ব্যবহার করতে হয়, একটু একটু করে।

মন আর শরীর মিশে গিয়ে পরিপূর্ণ হয়েছিল ওদের দীর্ঘ অপেক্ষার রাত।

রামনারায়ণ বয়স জনিত কারণে অসুস্থ হওয়ায়, এখন জমি জায়গা সম্পত্তির দায়িত্ব নিয়েছে বিজয়নারায়ণ। জয় চিরকালই একটু অগোছালো। নিজের লেখাপড়া আর স্কুল নিয়েই সে ব্যস্ত। আবার বছর পাঁচেক পরে চৌধুরী বাড়িতে একটা খুশির হাওয়া বইছে। এবাড়ির ছোট বউ সন্তান সম্ভবা। অদ্ভুতভাবে একইসময় বড় বউও সন্তান সম্ভবা।

বিজয় এবার আশাবাদী। দুই মেয়ের পরে এবার নিশ্চয় তার ছেলেই হবে। জয়নারায়ণ অবশ্য এত ভাবেনি। সে বাবা হতে চলেছে এতেই সে খুশি। তবুও দুই ভায়ের যখন একই সাথে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তখন স্বাভাবিক ভাবেই গুপ্তিপাড়ায় এটাই এখন আলোচ্য বিষয় কে জমিদার রামনারায়ণ চৌধুরিকে নাতির মুখ দেখাতে পারে?

বড় বউ শিবানী ভারী শরীর নিয়ে দিন রাত পূজো দিয়ে বেড়াচ্ছে। ছোট বউ মৃন্ময়ী দিনরাত নভেল মুখে নিয়ে বসে আছে।

জয়নারায়ণ মৃন্ময়ীর পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, মিনু, আমাদের মনে হয় ছেলেই হবে! একটুও উত্তেজিত না হয়ে মৃন্ময়ী বলল, আমাদের সন্তান হবে। আমি চাই আমাদের একটা সুস্থ সন্তান হোক।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আর কথা বলার সাহস হয়নি জয়ের।

পান্নাবালা দুই বউকে ছেলে হবার মাদুলি পরিয়ে দিয়েছেন। ছোট বউ দু'দিন পরেই সে মাদুলি হারিয়ে ফেলেছে।

অলক্ষুণে বাচাল মৃন্ময়ীকে এবাড়ির কেউ কোনো দিন পছন্দ করে না।

বড় ছেলের মেয়ে দুটো একটু অবহেলাতেই মানুষ হচ্ছে এবাড়িতে। যদিও কাকা স্কুল শিক্ষক বলে, তারা স্কুল যাচ্ছে, তবু ষোল হলেই বিয়ে দেবে ঠিক করেই রেখেছে বিজয়নারায়ণ।

শিবানী সেদিন মৃন্ময়ীর ঘরে ঢুকে কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, এবার যদি মেয়ে হয়, তাহলে নাকি সে বাড়ির পিছনের পদ্ম পুকুরে গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরবে।

মৃন্ময়ী কোনোদিন দিদিকে বুঝিয়ে কিছু শেখাতে পারেনি। এমন কি বিজয়নারায়ণ তার দুই মেয়ে সবিতা আর রমিতাকে কাকিমার কাছে ঘেঁষতে অবধি দেয় না। যদি মৃন্ময়ী ওদের মাথায় বিষ ঢোকায়, তাই! মৃন্ময়ী যেন বাড়ির মধ্যে থেকেও চৌধুরী বাড়ির নিয়ম কানুনের বাইরে তার নিজস্ব জগৎ তৈরি করে নিয়েছে। ওর গঠিত এই জগতে ওর অনুমতি ব্যতীত কারো প্রবেশ নিষিদ্ধ।

তেমনি রামনারয়ণের বাড়ির আঁতুর ঘরে কোনো পুরুষ ডাক্তার প্রবেশ নিষিদ্ধ।

শহর থেকে কোনো এক মহিলা ডাক্তারকে গাড়ি করে তুলে আনা হয়েছে, দুই বউ-এর প্রসবের জন্য।

একই দিনে দু'জনেরই প্রসব বেদনা উঠল। বড় বউ অবশ্য দু'দিন ধরে কাতরাচ্ছিল কিন্তু প্রসব বেদনায় নীল হয়ে গেছে মৃন্ময়ীর ফর্সা মুখ। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে মৃন্ময়ী। ডাক্তার বলল, মৃন্ময়ীর আর হয়তো বাচ্চা নাও হতে পারে। জয়নারায়ণের কপালের জোরেই নাকি এই সন্তান সুস্থ ভাবে চিৎকার করল, চৌধুরীদের জমিদার বাড়ির আঁতুর ঘরে।

চৌধুরীদের বাড়িতে সকলে বলাবলি করছিল, শিবানীর তার ইচ্ছা শুনেছে, তার একটি ফুটফুটে ছেলে হয়েছে।

মৃন্ময়ীর কোলে মেয়ে।

যাক অবশেষে বংশ রক্ষা করতে পেরেছে বিজয়ের স্ত্রী। তাকে আর পদ্ম পুকুরে ডুবেও মরতে হয়নি।

রামনারায়ণ নাতির নাম রেখেছে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী।

শিবানীর গলায় উঠেছে শ্বশুরের আশীর্বাদ স্বরূপ সোনার বিছে হার। গরবিনী শিবানী এতদিনে চৌধুরী বাড়ির বড় বউ-এর সম্মান পেয়েছে। কোল আলো করা ছেলে নিয়ে সে এখন পান্নাবালাদেবীর বড় আদরের বউ হয়েছে।

মৃন্ময়ীর মেয়েকে কেউ অবহেলা করতে পারেনি। যা একখানা দজ্জাল বউ, তার মেয়ে হলেও তাকে সম্মান দেখাতেই হবে।

জয়নারায়ণ ক'দিন মন খারাপ করে ছিল বলেই, মৃন্ময়ী বলেছিল, মেয়ে নিয়ে সে বাপের বাড়ি চলে যাবে। গুপ্তিপাড়ায় ঘরে ঘরে জেনে যাবে জমিদার বাড়ির বউ ঘর ছাড়া হয়েছে।

সকলেই ওই পাগলাটে বউ-এর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়েই থাকে। কৃষ্ণেন্দুর অন্নপ্রাশনের সাথে জয়শ্রীরও অন্নপ্রাশন করতে হবে বলে বাড়িতে প্রস্তুতি

অশান্তি বাঁধাল মৃন্ময়ী।

তাকে যতই বোঝানো হোক যে, মেয়েদের জন্মটাই নাকি অভাগীর, তার আবার ঘটা করে মুখে ভাত কী করে হবে?

মৃন্ময়ী শ্বশুর-ভাসুর না মেনেই বলল, তাহলে আমিই আমার গয়না বেচে গ্রামবাসীকে নিমন্ত্রণ করে আসবো। জয়নারায়ণ অনেক বুঝিয়েও স্ত্রীকে শান্ত করতে না পেরে, জয়শ্রীরও বেশ ঘটা করে অন্নপ্রাশন করা হলো।

দিনরাত মেয়েকে নিয়ে আদিখ্যেতা করে চলেছে মৃন্ময়ী। আড়ালে সকলেই বলে, ছোট বউ-এর মাথায় একটু আধটু গন্ডগোল তো আছেই। তবে প্রাণে দয়া-মায়া আছে। গরীব মানুষদের দান-ধ্যান করতে জানে।

রামনারায়ণ একদিন ছোট বউমাকে ঘরে ডেকে বললেন, তোমার এই মেয়ে নিয়ে আদিখ্যেতা মোটেই পছন্দ করি না। লোকজন হাসাহাসি করে এ নিয়ে। কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে একই ক্ষণে জন্মেছে মানেই তোমার মেয়ে এ বংশের মান বাড়িয়েছে, তা কিন্তু মোটেই নয়।

তুমিও আর একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দাও, তাকেও চৌধুরীবংশ মাথায় করে রাখবে!

মৃন্ময়ী নিজের ঘোমটা শ্বশুরের সামনে খুলে, চোখ তুলে উঁচু গলায় বলল, মেয়েটা যখন এই চৌধুরীদের ঔরসেই হয়েছে, তখন এই বংশের সমস্ত সম্পত্তির ওপর জয়শ্রীর সমান অধিকার আছে। দেশে আইন বলেও তো একটা কথা আছে।

রামনারায়ণ বোধহয় স্বপ্নেও কল্পনা করেনি ওই এক রত্তি মেয়ে তার মুখের ওপর এমন কথাও বলতে পারে!

মৃন্ময়ী বলেছিল, আমার মেয়েকে আমি ডাক্তার করবো। যেমন ডাক্তার কলকাতা থেকে এসেছিল আমাদের বাড়িতে, তেমন ডাক্তার।

শুনেই হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল পান্নাবালার। সত্যিই বউ-এর মাথার গোলমাল আছে। এমন বেআক্কেলে কথা কি কেউ বলে?

ভয়ে হোক আর জমিদার গিন্নির ভক্তিতেই হোক এবাড়িতে কেউ

মৃন্ময়ীর মুখের ওপর কথা বলে না।

ও মেয়ে তো বলেই দিয়েছে, তার মেয়ের ভবিষ্যতের সামনে যদি কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ায়, আঁশবটির এক কোপে তার গলা নামাবে।

মৃন্ময়ী স্বামী, শ্বশুর, ভাসুর কাউকে মানে না! ছোট বউ-এর মুখের কথা আর কাজের মধ্যে বিস্তর ফারকও কেউ কোনোদিন দেখেনি চৌধুরী বাড়িতে। অগত্যা সকলেই সমঝে চলে এসেছে ওকে। সেই মৃন্ময়ীর ঝুলপিতে এখন রূপলী চুলের রেখা। রামনারায়ণ চৌধুরী মারা গেছেন। বিজয়নারায়ণই এখন জমি জায়গা দেখাশোনা করছে। জয়নারায়ণ আর বছর দুয়েক পরেই রিটায়ার করবে।

পান্নাবালার বয়স হলেও সংসারের কর্তৃত্ব এখনো তার হাতে। শিবানী বড় বউ হলেও মৃন্ময়ী আর পান্নাবালার নির্দেশেই নিজেকে ভাসিয়ে দিতে বেশি পছন্দ করে এসেছে আজীবন। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ষোলর মৃন্ময়ীর সাথে আজকের মৃন্ময়ীর পার্থক্য একটাই, আগে সে সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করতো, সকলের কাছে অনুমতি চাইতো, আর এখন সে তার দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানায়।

আজ জমিদার বাড়িতে রান্নার বড় ঘটা। আজ দুই ছেলে মেয়ে ফিরছে। কৃষ্ণেন্দু আর জয়শ্রী। কৃষ্ণেন্দু পেশায় অধ্যাপক, কয়েক বছর বিদেশে থেকে আজ সে ফিরছে। কৃষ্ণেন্দু সত্যিই খুব ভালো ছেলে। কাকিমা মৃন্ময়ীর প্রতি তার আলাদা একটা সম্মান আছে।

মৃন্মমীর মেয়েও বিদেশ থেকে ফিরছে। মৃন্ময়ী গলা উঁচু করে বলেছে আমার মেয়ে বিলেত ফেরত ডাক্তার।

এতদিনে মৃন্ময়ীর স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এই গ্রামের বাধা নিষেধের বেড়াজাল থেকে বের করে সে মেয়েকে কলকাতার হোস্টেলে রেখে পড়িয়েছে, বিজয়নারায়ণের সাথে আর পান্নাবালার সাথে সংঘর্ষ করে মেয়ের বিদেশ যাবার টাকা আদায় করতে হয়েছে তাকে। জয়নারায়ণ

কোনোদিনই মা আর দাদার মুখের ওপর কিছু বলে উঠতে পারেনি। জয়শ্রী মাকে ফোন করে জানিয়েছে, সে আজ সকাল দশটা নাগাদ ঢুকবে। কৃষ্ণেন্দু ফিরেছে ভোর রাতে।

পেল্লাই বাড়ির বাইরে অনেকেই ভিড় জমিয়েছে, এ বাড়ির ডাক্তার মেয়েকে দেখবে বলে।

একমাত্র, বিজয়নারায়ণই একটু বিরক্ত। তার দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে সে। তাদের ছেলে পুলে হয়ে গেছে। আর এই বত্রিশের ধিঙ্গি মেয়ে ডাক্তার হয়ে বাড়ির মান-সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। যেমন নির্লজ্জ ছোট বৌমা, তেমন তার মেয়ে।

কৃষ্ণেন্দু আবার গর্ব করে বলছে, ভাবতেই ভালো লাগছে আমার বোন এফ আর সি এস পেয়েছে।

বিরক্ত বিজয়নারায়ণ মাকে গিয়ে বলল, মা দয়া করে এবার জয়ের মেয়ের একটা বিয়ে দিও। এই বয়সে জয়ীর জন্য পাত্র পেলে হয়!

জয়শ্রী বাড়িতে ঢুকেই ছুটে এসে তার মাকে জড়িয়ে ধরেছে। মৃন্ময়ীর চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে জয়শ্রীর জামা।

মনে পড়ে যাচ্ছে মৃন্ময়ীর, কত বছর এই মেয়ের জন্য লড়াই করেছে সে। সকলে চেয়েছিল, জয়শ্রীর বিয়ে দিয়ে দিতে। ঠিক সেই সময়ই মৃন্ময়ী জেদ করে মেয়েকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। কতদিন জয়নারায়ণ স্ত্রীর সাথে কথা বলেনি ওই অপরাধে। সকলেই বলতো, বড্ড অলক্ষুণে বউ মৃন্ময়ী। তার মেয়েও নাকি তার মতোই বাচাল হবে। সব অপমানের উপযুক্ত জবাব দিতে আজ জয়শ্রী ফিরে এসেছে ডাক্তার হয়ে।

হঠাৎ বিজয়নারায়ণ নিজের বুকের বাঁদিকটা হাত দিয়ে চেপে ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কৃষ্ণেন্দু কিছু না বুঝেই তাকিয়ে আছে বাবার মুখের দিকে।

জয়শ্রী বলল, দাদাভাই! হারি আপ...

মুখে ব্লো করো, বুকে পাম্প করছি আমি। নিজের ব্যাগ খুলে ইনজেকশন পুশ করল জয়শ্রী।

কৃষ্ণেন্দু শুধু বোনের কথা মতো কাজ করে চলেছে।

বিপদকালীন পরিস্থিতির জন্য বেশ কিছু জিনিস সর্বদাই জয়শ্রীর হাতের কাছে থাকে। এর আগেও ট্রেনে-বাসে বহুবার অনেক মানুষের জীবন রক্ষা করতে পেরেছে জয়শ্রী, এই এমার্জেন্সী ওষুধের সাহায্যে।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল জয়নারায়ণ। তখনও একটা আঙুলকে ছেদ করে ব্লাড বের করে যাচ্ছে জয়শ্রী।

পান্নাবালা বলছেন, জানতাম ওই অলক্ষুণে মেয়ে বাড়িতে পা দিলেই কিছু অঘটন ঘটবেই। ঘরের মেয়ে বিদেশে অজাত-কুজাতের সঙ্গে মিশে বাড়ি ফিরলে, সে বাড়িতে আর লক্ষ্মী টেকে না। মুখে গজগজ করে কপাল চাপড়াচ্ছেন পান্নাবালা। শিবানীও স্বামীর এমন অবস্থা দেখে বিহ্বল হয়ে বলে বসল, জয়শ্রীর জন্যই কি তবে এমন হলো?

শুধু পরীক্ষা দিয়ে চলেছে মৃন্ময়ীর মেয়ে।

বিজয়নারায়ণ চোখ খুলতেই জয়শ্রী বলল, জ্যেঠু তুমি রেগুলার প্রেসার চেক করাও? ওষুধ খাও?

বিজয়নারায়ণ ধীরে ধীরে বলল, প্রায় দিন পাঁচেক প্রেশারের ওষুধটা খাওয়া হয়নি।

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে এই প্রথম জয়শ্রীর মাথায় হাত বোলাল বিজয়নারায়ণ চৌধুরী।

গুপ্তিপাড়ায় নিমেষে রটে গেল, জয়নারায়ণের মেয়ে বিখ্যাত ডাক্তার হয়ে ফিরেছে।

রান্নাঘরে বড় জা শিবানী আর মৃন্ময়ী খাবার সাজাচ্ছিল। শিবানী বলল, মিনু একটা কথা বলি...

তোর দাদা যখন জয়শ্রীকে মেনেই নিলেন, তখন সত্যিটা বলতে আর

দোষ কোথায়?

মৃন্ময়ী রাগ আর ঘৃণা মিশ্রিত চোখে তাকিয়ে বলল, কেন দিদি? সাত ভরির হার গলায় দুলিয়ে, ছেলে কোলে নিয়ে সৌভাগ্যবতী সাজার সময় তো তোমার সত্যিটা বলতে ইচ্ছা করেনি? কখনও তো কাউকে বলোনি যে, কৃষ্ণেন্দু আমার ছেলে, সেদিন রাতে তোমার আবার মেয়েই হয়েছিল! আমি যখন ডাক্তারকে বলেছিলাম, ছেলেটাকে দিদির পাশে দিন আর মেয়েটাকে আমার পাশে, আমি তোমাকে পদ্ম পুকুরে ডুবে মরা থেকে বাঁচিয়ে ছিলাম, বুঝেছিলাম অল্প হলেও তোমারও জ্ঞান ছিল তখন। কই তুমি তো সেদিন প্রতিবাদ করোনি দিদি?

আজ যখন আমার বুকের রক্ত দিয়ে আমি আমার মেয়েকে মানুষ করেছি, সে দাদার জীবন ফিরেয়ে দিয়েছে, তখন তুমি তোমার মেয়ের পরিচয় দিতে চাইছো? নিজের ছেলেকে তোমার কোলে বড় হতে দেখে বুকটা ফেটে যেত আমার, কই তখন তো তুমি আমার ছেলেকে কোলে দিয়ে বলোনি, সত্যিটা বলে দে ছোট। আজ বত্রিশ বছর পর তুমি সত্যি খুঁজতে চেও না দিদি। সেদিনও বলেছিলাম, বঁটির এক কোপে শেষ করবো তাকে যে আমার মেয়ের দিকে তাকাবে। আজও ওই একই কথা বললাম দিদি।

রান্না ঘরের বাইরে থেকে সবটা শুনে জয়শ্রী কিছু না শোনার ভান করে ভিতরে এসে বলল, জানো মা, আমাকে সকলে বলে, তোমার মা নিশ্চয় কোনও মহিয়সী মহিলা, তাই তোমার এত সাহস!

আমি সকলকে গর্ব করে বলি, আমার মায়ের নাম মৃন্ময়ী চৌধুরী।

মৃন্ময়ী সেই ছোটবেলার মতো মেয়ের গালে গাল ঘঁষে বলল, তুই আমার মেয়ে জয়ী। তুই আমার মেয়ে। আমার গর্ভেই তোর জন্ম। তোর জন্যই সারারাত আমি প্রসব বেদনা সহ্য করেছিলাম। তুই শুধুই মৃন্ময়ী চৌধুরীর মেয়ে জয়শ্রী চৌধুরী।